

একাত্তর এবং আমার বাবা

হুমায়ূন আহমেদ



প্রথমে একটা স্কুলের আসন দেখছিলেন। বসে
 এই পড়ে নিজে বসে চলে যাচ্ছিল। অন্য গাটে
 চলেছে জেগে শানবাসে বসে। এখানে আসলে
 গাড়িতে সন্দেরে কিছু একটাও হলে এখানে
 আসার ভাল লাগছিল না। সন্দেরে ঘর ভাঙে,
 পরিষ্কারি ইত্যাদি দেখে জানি হেঁচকা
 উঠেছিলেন। হ্যাঁই তাই হেঁচকা দুটিকে
 চলে আসে চাচ্ছিলেন। অসুস্থ পুরা দুজনে
 সাময়িক শিশুরে আসার উদ্দেশ্যে।
 হলে দেখার সঙ্গে দেখা করলে মাঠে
 উদ্দেশ্যে তার দেখে গিয়েই হই। বসে
 'কিবে ওই মাসেরা? জানে বসার' হই
 'গায়ে হলে আছে, জানি কোন এখানে
 যেসবই উদ্দেশ্যে দেখে হই। জানি
 'কিছু যদি কিছু হই।'
 'কিছু হই উদ্দেশ্যে'
 উদ্দেশ্যে হই উদ্দেশ্যে হই গান দেখার
 তাতে হই হই হই হই হই হই হই
 প্রকাশ হই হই হই হই হই হই হই
 হই হই হই হই হই হই হই হই



১৯৭১ সনের উত্তাল সময়ে অনেকটা ব্যক্তিগত ডায়েরির মতো করে লেখা হুমায়ূন আহমেদের এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি হঠাৎ করেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণকারী বাবা ফয়জুর রহমানের জীবনের শেষ সময়টুকু ধরে রাখার জন্যে হুমায়ূন আহমেদ সম্ভবত অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দিয়ে তাদের পরিবারের বিপর্যয়ের শেষ অংশটুকু লিখিয়ে নিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ বা মুহম্মদ জাফর ইকবাল কেউই তখন পরবর্তী জীবনের কথাসাহিত্যিক হিসেবে গড়ে ওঠেননি। সেই হিসেবে এটি এক ধরনের ঐতিহাসিক দলিল। বইটি প্রকাশ করার সময় পাঠকদের আত্মহ এবং কৌতূহলের বিষয়টি বিবেচনা করে দুই ভাইয়ের মূল হাতের লেখার প্রতিচ্ছবিও এই বইয়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রচ্ছদ • আহসান হাবীব



হুমায়ূন আহমেদ

জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ মোহনগঞ্জে। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ছাত্র। পি,এইচ,ডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডেকোডা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। অধ্যাপনা করেছেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী হুমায়ূন আহমেদ কথা সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার।

মৃত্যু ১৯ জুলাই ২০১২, নিউইয়র্কের বেলভিউ হাসপাতালে।

'তুমি' বসে
 তাঁর মানুষকে তাঁর বলে সান দে
 ততে সে হারা করতে পারে না। অনেক
 প্রকাশ হয়ে যায় দেখে বিব্রত হয়
 তাঁর বিব্রত মুখেই ফিরে আসি।
 'হয়ে' তাঁর কিছু করার নেই।
 পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি, প্রাকটিকলে
 হয়ে গিয়েছে। সফলতা শুরু হা
 জাতীয় পরিষদের জরিপের সুস্বাদু প্রতি
 বিব্রত ওর একে সুস্বাদু করে দে

একাত্তর এবং আমার বাবা



একাত্তর এবং আমার বাবা

হুমায়ূন আহমেদ

প্রথমে একটা কড়ের আত্ম দেন্দুলাম। হলেই ছেলেটা
শে'লত নিম্নে বাই চলে যাচ্ছিল। বাস্তু গাটে লোকজন
চলেছে, অসুচ মানবান নেই। এখানে বেশানে কান্ডি
গাজিয়ে সকলেই কিছু একটা জানে অথবা জানে।
আমার ভাল লাগছিল না। সকলের হারভার, রাজনৈতিক
পরিষ্কৃতি ইত্যাদি দেখে আমি হেসে মগ্নিত প
উঠেছিলাম। ঘাটে তাঁই বোর টাটকে নিম্নে বাস
চলে হাত চাখিলাম। অসুচ গুনা দুজনেই সুভা
পানসিক সচনে আমার উল্টো। অসুচ হো
হলে কোম্বু সবে দেখা করুতে যাই তখন তা
উল্টাও তাই দেখে বিস্মিত হই। যদি
কেন্দুলাম? আম্ব বাস্তু চলে যা
কেন্দুলাম? আম্ব বাস্তু চলে যা

ভূমিকা

প্রায় হঠাৎ করেই হুমায়ূন আহমেদের এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে যখন এটি লিখেছিল তখনো সে হুমায়ূন আহমেদ হয়নি। ঠিক কখন এটি লিখেছে কেউ সেটি ভালো করে বলতে পারে না। অনুমান করা হয় একান্তরেই সে এটি লিখেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে মারা যাওয়া আমার বাবার মৃত্যুর ঘটনাটিই ছিল মূল বিষয়—তার কারণ সে ঠিক যে-জায়গায় শেষ করেছে তার পরের অংশটুকু আমার লেখা। হুমায়ূন আহমেদ সম্ভবত প্রথম অংশটুকু শেষ করে বাকিটুকু আমাকে লিখতে বলেছে, কারণ শেষ দিনটিতে আমি আমার বাবার সাথে ছিলাম; তাই শুধু আমিই সেটি লিখতে পারব। আমার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল তাই আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনি কখন এটি লিখেছি। আমার ভাইবোন বা মাও সেটি মনে করতে পারেনি কাজেই সঠিক সময়টি বলা যাচ্ছে না, অনুমান করছি একান্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি লেখা হয়েছিল।

এটি প্রায় ব্যক্তিগত ডায়েরির মতো, কাজেই এটাকে বই হিসেবে প্রকাশ করা উচিত হবে কি না সেটা নিয়ে অনেক সন্দেহ ভাবনা করা হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের লেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার পরে আমার লেখা অংশটুকু জুড়ে দেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে আমার মা, ভাই, বোন সবার সাথে আলোচনা হয়েছে। আমি নিজের অংশটুকু জুড়ে দিতে খুবই অনিচ্ছুক ছিলাম কিন্তু আমাদের পরিবারের সবাই পুরো লেখাটুকু পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে শেষ অংশটুকু যুক্ত করে দেয়া উচিত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তাই এই প্রথমবার হুমায়ূন আহমেদের একটি লেখার সাথে আমার লেখা জায়গা করে নিয়েছে।

আমি জানতাম হুমায়ূন আহমেদ একজন জনপ্রিয় লেখক। লেখকদের বেলায় শব্দটা জনপ্রিয় না হয়ে পাঠকপ্রিয় হওয়ার কথা, যারা পাঠক শুধু তারা ই লেখকের ভক্ত হতে পারে— অন্যদের তো আর সেই সুযোগ নেই। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে হুমায়ূন আহমেদ শুধু পাঠকপ্রিয় ছিল না, সে অসম্ভব জনপ্রিয় মানুষ ছিল। কেমন করে সে সাধারণ মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হলো আমি মাঝে মাঝে সেটা নিয়ে ভেবেছি, মনে হয় সেটি ঘটেছে তার বহুমাত্রিক প্রতিভার জন্যে। বাংলাদেশে টেলিভিশনের জন্যে সে যে-নাটকগুলো লিখেছে তার জনপ্রিয়তা ছিল অবিশ্বাস্য। আমি তখন দেশের বাইরে, তাই নিজের চোখে দেখিনি কিন্তু শুনেছি যখন টেলিভিশনে তার নাটক দেখানো হতো তখন বাংলাদেশের পথঘাট নাকি জনশূন্য হয়ে যেতো। মনে হতো বুঝি কারফিউ দেয়া হয়েছে। তার নাটকের চরিত্রকে ফাঁসি দিয়ে যেন মারা না হয় সেজন্য দেশে

আন্দোলন হয়েছিল! চলচ্চিত্র তৈরি করার তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তারপরও সে অসাধারণ কিছু ছবি তৈরি করেছিল। প্রকৃতির জন্যে গভীর একটি মায়্যা ছিল, বড়ো ছেলে নুহাশের নামে সে 'নুহাশ পল্লী' তৈরি করেছে; সেটি এই দেশের মানুষের কল্পনার একটি ভূখণ্ড। সাধারণ মানুষ খুব বেশি জানে না—আমরা জানি, সে খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারত আর চমৎকার ম্যাজিক দেখাতে পারত। সবচেয়ে বড়ো কথা মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম হিসেবে তার মুক্তিযুদ্ধের জন্যে গভীর এক ধরনের ভালোবাসা ছিল। একটা সময় ছিল যখন টেলিভিশনে মানুষের মুখে 'রাজাকার' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তখন সে টিয়াপাখির মুখে 'তুই রাজাকার' কথাটি টেলিভিশনে উচ্চারিত করিয়েছিল। তরুণ প্রজন্মকে সে জোছনার আলো আর আকাশ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। তরুণ-তরুণীদের সে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। সম্ভবত সে-কারণেই তার ভক্ত গুধু ভালো কিছু বোদ্ধা পাঠকের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার জন্যে এই দেশের সকল স্তরের মানুষের ছিল গভীর এক ধরনের ভালোবাসা।

আমি সেই ভালোবাসার কথা জানতাম কিন্তু সেটি যে কত গভীর কিংবা কত বিস্তৃত সেটি কখনো কল্পনা করতে পারিনি। তার মৃত্যুর পর আমি প্রথমবার সেটি অনুভব করতে পেরেছিলাম। একজন লেখক হিসেবে এই দেশের মানুষ এত গভীরভাবে, এত তীব্রভাবে ভালোবাসা দেখাতে পারে সারা পৃথিবীতে সম্ভবত তার খুব বেশি উদাহরণ নেই। আমি নিজে জানি কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে তখন জানতে পারিনি, পরে শুনেছি তারে সম্বাহিত করার পুরো বিষয়টি কয়েকদিন টেলিভিশনে সরাসরি দেখানো হয়েছিল। গুধু তাই নয়, এই দেশের সকল মানুষ টেলিভিশনের সামনে বসে সেটি দেখেছে।

তার জনপ্রিয়তার বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে বলছি কারণ এই উপলব্ধির সঙ্গে এই বইটি প্রকাশনায় একটি সম্পর্ক আছে। হুমায়ূন আহমেদ যখন এই স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি লিখেছে তখনো সে প্রকৃত হুমায়ূন আহমেদ হয়ে ওঠেনি। লেখাটির মাঝে দুর্বলতা আছে, ছেলেমানুষী আছে, ভুল তথ্য আছে, প্রচুর বানান ভুল আছে— হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকলে এটিকে ছাপার অক্ষরে দেখাতে চাইত কি না আমার জানা নেই। কিন্তু তার জন্যে এই দেশের মানুষের এত গভীর আগ্রহ রয়েছে যে, আমার মনে হয়েছে তরুণ হুমায়ূন কেমন করে লিখত সেটি হয়তো তাদেরকে দেখতে দেয়ার একটি সুযোগ করে দেয়া দরকার। প্রায় অর্ধশত বছর আগে লেখা কাগজগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে, লেখা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারপরও আমি এই বইয়ে ভুলভ্রান্তিসহ তার নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়েছি।

তার নিজের হাতে লেখা কোনো পাণ্ডুলিপি সেভাবে রক্ষা করা হয়েছে কি না আমি নিশ্চিত নই—তাই আমার মনে হয়েছে অন্তত এক জায়গায় সেটি সংরক্ষিত থাকুক। একুশ বছরের একটি তরুণ কেমন করে লিখত সেই তথ্যটি অনেকের

কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হতেই পারে। ভবিষ্যতে কেউ যদি গবেষণা করতে চায় এখান থেকে নিশ্চিত অনেক তথ্য পেয়ে যাবে।

এই পাতুলিপিটি মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা। মুক্তিযুদ্ধের সেই স্বাসরুদ্ধকর সময়টি এখানে খুব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এটি মূলত আমাদের পরিবারের কথা, কাজেই পড়ার সময় একান্তরের সেই সময়ের ছবিটুকু আবার আমার চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। যারা একান্তর দেখিনি, তারা এটি পড়ে সেই দুঃসহ সময়ের অনুভূতিটুকু খানিকটা হলেও অনুভব করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সময়টাতে সারা দেশে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ ছিল। এই লেখাটিতে সেটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা মহকুমার দায়িত্বে থাকা আমার পুলিশ অফিসার বাবা অত্যন্ত জটিল একটা সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টানা পোড়নের মাঝে কীভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন সেটিও এখানে খুব স্পষ্ট।

হুমায়ূন আহমেদ অসাধারণ কথাশিল্পী হলেও সে খুবই দুর্বল ইতিহাসবিদ। আমি সবাইকে সতর্ক করে দিই, তার কোনো লেখা থেকে কেউ যেন কখনো কোনো ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে। আমি লক্ষ করেছি কোনো একটা বিচিত্র কারণে সত্য ঘটনার খুঁটিসটি নিয়ে সে কখনো বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাত না। তার নানা বইয়ের নানা স্মৃতিচারণে অনেক কিছুই আছে, যেখানে সে একটু কষ্ট করে নির্ভুল সঠিক তথ্য দিতে চেষ্টা করেনি। আমি সেটা ভালো করে জানি, কারণ আমাকে নিয়ে কিছু একটা লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে এমন চমকপ্রদ কিছু কথা লেখা যা প্রায় সময়েই অনেক অতিরঞ্জিত। বৈজ্ঞানিক তথ্যও তাকে বলে দেওয়ার পরেও শুদ্ধ করার চেষ্টা করে নি। আমার একজন বয়স্ক আমেরিকান বন্ধু আমাকে বলেছিল, Don't ruin a good story with facts— হুমায়ূন আহমেদ হচ্ছে এই দর্শনের সবচেয়ে বড় অনুসারী! সে ছোটোখাটো সত্য দিয়ে কখনোই মজার একটা গল্প নষ্ট করেনি!

এই বইয়ের যে সব তথ্য সঠিক নয় বলে আমি নিশ্চিতভাবে জানি তার কয়েকটা উদাহরণ এইরকম :

ক) তার নিজের উপন্যাসের যে কাহিনিটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটি নন্দিত নরকের কাহিনী নয়। সেই কাহিনিটি শঙ্খ নীল কারাগারের। সম্ভবত 'নন্দিত নরকে' নামটি তার প্রিয় নাম, ভেবেছিল এই বইয়ে এই নামটিই দেবে, শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি দিয়েছিল তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের। (পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

খ) পঁচিশে মার্চ রাতে পিরোজপুর থানায় আমার বাবা একা ওয়ারলেস রুমে যুদ্ধ শুরু ঘটনা শুনেন নি— আমরা সবাই তার সাথে ছিলাম। (পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫)

গ) আমার বাবাকে ফিরে পাওয়ার চিঠিটি নাজিরপুরের ওসি লিখিনি— লিখেছিল পিরোজপুরের ওসি। (পৃষ্ঠা ১৪২/১৪৩)

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো বের করা সম্ভব, কিন্তু আমার ধারণা— কী বলতে চাইছি সেটা এই উদাহরণগুলো দিয়েই বোঝা সম্ভব। কাজেই ইতিহাসবিদরা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এই বইটির দ্বিতীয় ভাগে আমার অংশটুকু জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র আমার বাবার জীবনের পরিসমাপ্তির ঘটনাটুকুর পুরোটা পূর্ণ করার জন্যে। যেভাবে লিখেছিলাম মোটামুটি সেভাবেই আছে, বোঝার সুবিধের জন্যে কোথাও হয়ত একটি-দুটি শব্দ যোগ করেছি কোথাও বাদ দিয়েছি। দীর্ঘদিন পর, সেই টিন-এজ বয়সের লেখা পড়ে আমি নতুন করে এক ধরনের কষ্ট অনুভব করেছি। একান্তরে লক্ষ লক্ষ পরিবার এই কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। অসংখ্য পরিবার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে— আমরা খুব ভাগ্যবান যে, আমরা টিকে গেছি। আমার ধারণা আমরা যে-টিকে আছি এ-ব্যাপারে আমার মায়ের একটা খুব বড়ো ভূমিকা আছে।

হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতিচারণের পাণ্ডুলিপির মাঝে দুটি পৃষ্ঠা নেই। একটি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছে। অন্যটি দেখে মনে হয় সম্ভবত পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়ার সময় ভুল করার কারণে পৃষ্ঠা সংখ্যার এই গরমিল।

হুমায়ূন আহমেদ এই পাণ্ডুলিপির কোনো নাম রেখে যায়নি। সে নিজে নাম দিলে খুব চমৎকার একটা নাম দিতে পারত। আমি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে এর নামকরণ করেছি ‘একান্তর এর আমার বাবা’। এখানে একান্তর যেটুকু আছে আমার বাবাও প্রায় ততখানিই আছেন। আমার মনে হয়েছে এই লেখাটি ছিল আমাদের বাবার জন্যে হুমায়ূন আহমেদের এক ধরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

হুমায়ূন আহমেদ যখন এটি লিখেছে তখন সে পুরোনো বানান রীতিতে লিখেছে, এখানে যেহেতু হুবহু তিন হাতের লেখার অংশটুকু আছে তাই পাঠকদের কাছে উপস্থাপনের জন্যে ছাপা অংশটুকুতে প্রমিত বাংলা বানান রীতি প্রয়োগ করে এক ধরনের সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জফির সেতু। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।

এই বইয়ে হুমায়ূন আহমেদের পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করার জন্য আমি ভাতৃবধু রীতার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অংশটুকু প্রায় কাকতালীয়ভাবে ছোটোবোন শিখুর কাছে ছিল। তাদের দু-জনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটির প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছে অনুজ আহসান হাবীব। প্রচ্ছদে বাবার ছবিটি এসেছে বড়বোন সুফিয়া হায়দারের সংগ্রহ থেকে। হুমায়ূন আহমেদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ছবিটি দিয়েছে ছোট বোন রোখসানা আহমেদ। এটি হুমায়ূন আহমেদের শেষ বই, এ বইটিতে কীভাবে কীভাবে জানি পরিবারের সবার ভালোবাসার স্পর্শ রয়েছে!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

একাত্তর এবং আমার বাবা
হুমায়ূন আহমেদ

প্রথমে একটা সন্তানের আত্ম দশাখিলাস। হলের ছেলেরা
 যে লসে নিম্নে বাবা চলে যাচ্ছিল। বাবা ঘাটে লোক জন
 চলে, অসুস্থ মানবায়ন নেই। এখানে তখনো ক্যামিও
 প্রাজিন্সে সন্ধ্যায় কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে।
 আত্ম ডাল নাগদিল না। সন্ধ্যায় হার ডাব, রাজনৈতিক
 পরিষ্কারি ইত্যাদি দেখে আমি বেশা সংকীর্ণ হলে
 উঠেছিলাম। দুটা ডাব বোর দুটিকে নিম্নে বাসায়
 চলে অসুস্থ চাচ্ছিলাম। অসুস্থ গুণা দুজনের সুভারের জন্য
 প্রাথমিক সর্চনে আত্ম উল্টো। মামন বোকেয়া
 হলে কোম্পানির সনে দেখা করতে মাঠে তখন তার
 উল্টো। তার দেহের বিষ্টিত হই। বনি
 'কবে গুণা নাগেনব? আত্ম বাসায় চলে মাঠ।'
 'সবাই হলে আছে, আমি কেমন আধা মাঠ?'
 যেসেই উত্তরে দেখে সে মাগি তরু যোগ্য করিয়া বনি
 'কিছু যদি কিছু হয়।'
 'তুমি বড় উত্তর'
 তাঁর সান্ন্যাসকে জা বনে গান দেবার সুবিধা এই তম
 তাহে সে বাগ করতে পারে না। অনেক অসুস্থ
 প্রকাশ হলে মাম দেখে বিব্রত হরু হই। আমিও
 তাঁর বিব্রত মুখেই ফিরে চানি।

হলে আত্ম কিছু করবার নেই। অন্যত্র গির্জার
 পরিষ্কার দিমে দিমেই, প্রাকটিকালের মাঠে লোপাট
 হলে গিয়েছে। সন্ধ্যায় শুরু হই এবং শেষেই। ইত্যাদির
 আত্ম পরিবর্তন অধিকার অনুভূতি, প্রতিবাদে দেখা হই।
 ইত্যাদির ওরও একে সন্ধ্যায় করে সন্ধ্যায়, গনি, মাগি

সবখানে একটা ঝড়ের আভাস দেখছিলাম। হলের ছেলেরা বইপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছিল। রাস্তাঘাটে লোকজন চলছে, অথচ যানবাহন নেই। এখানে-সেখানে ব্যারিকেড সাজিয়ে সকলেই কিছু একটার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার ভালো লাগছিল না। সকলের হাবভাব, রাজনৈতিক-পরিস্থিতি ইত্যাদি দেখে আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। ছোটো ভাইবোন দুটিকে নিয়ে বাসায় চলে যেতে চাচ্ছিলাম। অথচ ওরা দু-জনেই স্বভাবে আর মানসিক গঠনে আমার উলটো। যখন রোকেয়া হলে শেফুর* সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন তার উল্লসিত ভাব দেখে বিস্মিত হই। বলি,

‘কিরে ভয় লাগে না? আয় বাসায় চলে যাই।’

‘সবাই হলে আছে, আমি কেন খামাখা যাব?’

হেসেই উড়িয়ে দেয় সে। আমি হুকু জোর করি। বলি,

‘কিন্তু যদি কিছু হয়।’

‘তুমি বড়ো ভীতু।’

ভীতু মানুষকে ভীতু বলে গাল দেবার সুবিধা এই যে, তাতে সে রাগ করতে পারে না। আমার খবর প্রকাশ হয়ে যায় দেখে বিব্রত হয় শুধু। আমিও তাই বিব্রত মুখেই ফিরে আসি।

‘হলেও আমার কিছু করার নেই। অনার্স থিওরি পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি, প্রাকটিকেলের ফাস্ট পেপারও হয়ে গিয়েছে। গণ্ডগোল শুরু হয় এর মধ্যেই। ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতুবি, প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল এবং একে অনুসরণ করে থ্রেফতার, গুলি, কারফিউ।’

* হুমায়ূন আহমেদের বোন সুফিয়া হায়দার।

আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যেই আমি এ সমস্ত থেকে
দূরে ছিলাম। খুঁচি বাই প্রস্তুদের মতই আমি রাজনীতি
থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতাম। সংসারে যে সমস্ত
নৈতিক বিজ্ঞাপন, অধিভোগ্য, মর্মান্বিত, বিশ্বাস করুন
আর নাই করার জাতির খবর শুনি খবরের কাগজের
হেতু লাইনের খবরের চেয়ে বেকালি শুকনু দিয়ে পড়ে
আমি সব সমস্ত সেইদিনের। মার ফল সুখীপ আমি
সবার উপরই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ইয়াহিয়ার উপর
বিরক্তি কেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পাঠিয়ে
ছিল। সুজিবদের উপর বিরক্তি দুই একদিন পাঠিয়েছিল
তাতে এত ছেঁচি-এর কি আছে। আমন কারণ
পরিষ্কার শুনি দিয়ে কামেলা নিউটনে মেলতে আমি
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম।

দোটে ডাই ইকরাল তখনো প্লাস মিটে পায়নি।
আমার মতেরে থাকত। রাজনীতি বিষয়ে তার কতটুকু
আগেই ছিল জানিনা। কিন্তু নিউটনে, মিছিল এই সমস্ত
জর উপরই নিউটনে মিলাবে মূল দেশের জাতি
বাত জিনটান বেড়িয়ে মাতৃভার মতেরে এর প্রশ্ন
নিম্নে। তার জন্যে উদ্বেগ জোগ করতে হত। সব সমস্ত
জান হত এই বুঝি কোন একটা কামেলার পড়ত।

আবশ্যিকতা তখন খুব সর্বজন মাগেছে। চাষিদের
নিউটনে, মিছিল, বিজ্ঞাপন। কামেলার মতই এ সমস্ত
থেকে নিজেকে চাটলে নিউটনে খোলেই নিজেকে
আবশ্য করবে দেখেছিলাম। আমি মামন টমান
হাতির এ দেশের অবস্থা জানে পড়ে চোখের

আমার রাজনৈতিক নিস্পৃহতার জন্যেই আমি এ-সমস্ত থেকে দূরে ছিলাম। গুচিবাইগুস্তদের মতোই আমি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতাম। সংসারে যে-সমস্ত লোক বিজ্ঞাপন, অবিশ্বাস্য, মর্মভ্রদ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন জাতীয় খবরগুলো খবরের কাগজের হেডলাইনের খবরের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়ে আমি সব সময় সেইদলের। যার ফলস্বরূপ আমি সবার ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। ইয়াহিয়ার ওপর বিরক্তি— কেন সে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পিছিয়ে দিলো। মুজিবরের ওপর বিরক্তি দুই একদিন পিছিয়েছে তাতে এত হইচই এর কি আছে। আসল কারণ পরীক্ষাগুলো দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে আমি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম।

ছোটো ভাই ইকবাল* তখনো হলে সিট পায়নি। আমার সঙ্গেই থাকত। রাজনীতি বিষয়ে তাকে কতটুকু আগ্রহ ছিল জানি না কিন্তু মিটিং, মিছিল এই সমস্ত তার উৎসাহ ছিল। শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার জন্যে রাত তিনটায় বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে এর প্রমাণ মেলে। তার জন্যে উদ্বেগ ভোগ করতে হতো। সব সময় ভয় হতো এই বুঝি কোনো একটা ঝামেলায় পড়ল।

আবহাওয়া তখন খুব গরম যাচ্ছে। চারিদিকে মিটিং, মিছিল, বিস্ফোভ। শামুকের মতোই এ-সমস্ত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিজের খোলেই নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম। আমি যখন টমাস হার্ডির ‘এ পেয়ার অব ব্লু আইস’ পড়ে চোখের

* মেজো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কালে বাস্তবিক ভিত্তিতে ফেরাছি তখন জুজুমা স্তন্যপান
 ছেলেটা মিছিল করে মাঠে। ওর হাত এঁই বুঝি এসে
 বলবে 'কি রে ওঁই গাধার মত ঘুমুড়িম তাম
 আমাদের সাপে।' ওর হাত থেকে কাচার তণ্ডুই
 কনের সামনে নিজে বেধেছিলাম Examine, Dont
 disturb, নীরবতাই কামড়া।

চুপুবে ইকরান এসে আবার দিন খান্ন সোটে
 উলি হিন্দুছে। বিকেনের দিকে এল ইকবালের বন্ধু আজ্ঞা
 নাটক না করে কিছুই বলতে পারে না। সে চোখ
 বড় বড় করে হাত নেড়ে মাথা দুনিয়ে সাবরন
 তা হল হাইকোর্টের সামনে পুন্ডা পুন্ডা পুন্ডা
 মেনিটারিতে মিথিয়াম হাইকোর্ট দুই পক্ষেই হলাফলি,
 এককার ঠেগর জাফল। হাইকোর্ট তার কথা বিশ্বাস
 দিলনা। তবে কিছু হাইকোর্টে তার জাট
 পেলনা। প্রকৃত্যে হাইকোর্ট পাতলা হলে দুই
 পক্ষে মতান্তর হইবেই চিকই। পুন্ডা হাইকোর্ট
 হাইকোর্ট দিনে বনেছে 'তিষ্ঠি' করবে না। দাবানল
 গঠে আবার হুইয়ে পড়ল। মেনিটারী পুন্ডা
 গও গর্জ। ছেলেটা ঠেগমাথে টেগরগ করে ফুটে
 লাগল। পুন্ডা অফিসদের বহলে হিমেরে
 আনি এতে মথেষ্ট সৌবুর বোধ করছিলাম।
 আমার হার তাইব এমন প্রকাক পাছিল মে আনি
 নিজের এই সন্তানের সৃষ্টি করে মেনিটারীর গিলে
 চমকে দিইছি।

জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলছি তখন শুনতাম ছেলেরা মিছিল করে যাচ্ছে। ভয় হতো এই বুঝি এসে বলবে 'কি রে তুই গাধার মতো ঘুমুচ্ছিস আয় আমাদের সাথে।' এর হাত থেকে বাঁচার জন্যেই রুমের সামনে লিখে রেখেছিলাম 'Examinee, Don't disturb, নীরবতাই কাম্য।'

দুপুরে ইকবাল এসে খবর দিল ফার্মগেটে গুলি হয়েছে। বিকেলের দিকে এল ইকবালের বন্ধু খাজা। নাটক না করে কিছুই বলতে পারে না। সে চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে যা বলল তা হলো হাইকোর্টের সামনে বাঙালি পুলিশ আর মিলিটারিতে সিরিয়াস ফাইট। দুই পক্ষেই গুলাগুলি, একশ'র উপর জখম। বলা বাহুল্য তার কথা বিশ্বাস হলো না। তবে কিছু একটা যে হয়েছে তার আঁচ পেলাম। সন্ধ্যা নাগাদ খবর পাওয়া গেল দুই পক্ষে মতান্তর হয়েছে ঠিকই। পুলিশরা রাইফেল ফেলে দিয়ে বলেছে 'ডিউটি করব না'। দাবানলের মতোই খবর ছড়িয়ে পড়ল। মিলিটারি পুলিশ সংঘর্ষ। ছেলেরা উৎসাহে টগবগ করে ফুটতে লাগল। পুলিশ অফিসারের ছেলে হিসেবে আমি এতে যথেষ্ট গৌরববোধ করছিলাম। আমার হাবভাবে এমন প্রকাশ পাচ্ছিল যে আমি নিজেই এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে মিলিটারির পিলে চমকে দিয়েছি।

অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। মেলিটারীর ডাক,
 জীপা আর পাকিলা ইপি আর ছয় নজাচুটা চোখে
 পড়ার মতই। হল থেকে মাঝারি দেড়ের মত ডাক
 স্থানি হদখা হেত তখনই 'দুই ৩ দুই ২' ইনি
 উঠত সনসু হল স্থানি থেকে। অতিরিক্ত ইংসাহীক
 ছুটা কাটত।

একটা দুইটা মেলিটারী হু
 সকাল বিকাল নাড়া কর।

পুলিশের গাড়ি ডনিও অবস্থি এ থেকে বেছই
 পোত না। তবে তারা প্রায়ই জন্ম বাৎলা বলে
 ছাটিলে বাজা মাগ করত। ছেলেরা তখন
 'কম বাৎলা, জন্মবাৎলা বলে' মতই চ্যাচাতে
 মকত।

সেখের কাছ থেকে মজার গজাবু অবরু পোজনা।
 কোর এক মেয়ে থেকে চিঠি পাচ্ছে না
 বলে কেঁদে কান্না মাতাচ্ছে। কাটা নাকি একটা
 মেলিটারী গাড়ির উপর গরম পানি ঢেলে
 দিয়েছে উপর থেকে। আবার আবেকজন তিন
 জনা থেকে মুখু হেলেছে এক পুলিশের গায়ে।
 অধিকাংশ সাল্লা সাপ্পাই। অধিকাংশ সবও হাসাকর।
 বনে বনে সুনলে ভালই লাগত। মেয়ে হলের
 ডিজিটাস' কুমটা যদিও বহুদিক থেকেই ডিজিটার
 দেব ডিসকাবেজা করবার জন্যেই তৈরী তরু
 ছেলেরা মেঝানে সেনে বড় একটা উঠতে চাইতেন।

অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। মিলিটারির ট্রাক, জিপ আর পশ্চিমা ই.পি.আর-দের নড়াচড়া চোখে পড়ার মতোই। হল থেকে যখনই দৈত্যের মতো ট্রাকগুলো দেখা যেত তখনই ‘দুর!’ ‘দুর!’ ধ্বনি উঠত সমস্ত হলগুলো থেকে। অতিরিক্ত উৎসাহীরা ছড়া কাটত

‘একটা দুইটা মিলিটারি ধর

সকাল বিকাল নাস্তা কর।’

পুলিশের গাড়িগুলোও অবশ্য এ-থেকে রেহাই পেত না। তবে তারা প্রায়ই ‘জয় বাংলা’ বলে চেষ্টা করে বাজিমাৎ করত। ছেলেরা তখন ‘জয় বাংলা’, ‘জয়বাংলা’ বলে ষাড়ের মতোই চেষ্টা করে থাকত।

শেফুর কাছ থেকে মজার মজার খবর পেতাম। কোনো এক মেয়ে বাড়ি থেকে চিঠি পাচ্ছে না বলে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। কারা নাকি একটা মিলিটারি গাড়ির উপর গরম পানি ঢেলে দিয়েছে উপর থেকে। আবার আরেকজন তিন তাল থেকে খুতু ফেলেছে এক পুলিশের গায়ে। অধিকাংশ গল্প গল্পই। অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর। বসে বসে শুনে ভালোই লাগত। মেয়ে হলের ভিজিটার্স রুমটা যদিও সবদিক থেকেই ভিজিটারদের ডিসকারেজ করার জন্যেই তৈরি তবু ছেলেরা সেখানে গেলে বড়ো একটা উঠতে চাইত না।

সেইসেইটা মেটা ভাল করেই জানত। শোণু মাতে আমাকে
 ঐসব ছেলেদের দলে না গেলে সাথে না ভাবে
 দাদাভাই দেড়ি বসে থাকতে থাকতে শিকার
 সাজিয়ে দুখলল সেই দিকে আমার কথা নম্বুর
 ছিল তাই তার মাঝে আমার কথা হল অল্পই।

‘কি রে ভাল?’

‘হ্যাঁ’

‘চল বামাম চল শাই’

‘না’

‘কাজে ফেলিও কাজ শুনে ওয়ালগো?’

‘ওই মজা লাগে।’

‘আম্ম তা হলে শাই’

‘আম্মম’

আম্মসান খেবর দিন আম্মসান উল্লাহ হলের তিনজন
 ছাত্রকে দেখেতার নিশ্চয় গিভেছে। ঠাণ্ডা
 থাকতেন আম্মসান উল্লাহ। দুজন একই ছোট্টের
 রুম ভেঙে গিয়ে দু বছর কাটানোর সময়কাটা
 ছিল বন্ধু সুলতান। দু জনই সত্য শ্রমের বসিকতা
 উৎসাহের সঙ্গে নিঃসংকোচেই বলা বলি করতেন।
 অল্পিয়ে মাঝে মাঝে তিনি হয় জালা এটি তাঁর
 গলে পাড়ে যেত। অতিশয়ক সুলতান গাম্বীনে
 খোঁজ খবর নিতেন আম্মদের। ছাত্র বহুসজদের
 কথা শুনেই মনে হল তিনজনের একজন ভাল
 কথা জানির নম্বত। তিনটার দিকে খোঁজ নিতে
 বেহুলাস। বাসায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি সত্যি
 যদি তাই হয় তবে উৎসাহের একটা খোঁজক
 পাওয়া যায়। স্নানও করে গল্প করতে পারি।

মেয়েরা সেটা ভালো করেই জানত। শেফু যাতে আমাকে ঐ সব ছেলেদের দলে না ফেলে, যাতে না-ভাবে দাদাভাই* দেখি বসে থাকতে থাকতে শিকড় গজিয়ে ফেলল সেই দিকে আমার কড়া নজর ছিল তাই তার সঙ্গে আমার কথা হতো অল্পই।

‘কি রে ভাল?’

‘হ্যাঁ।’

‘চল বাসায় চলে যাই।’

‘না।’

‘রাতে গুলির শব্দ শুনে ভয় লাগে?’

‘উহু মজা লাগে।’

‘আচ্ছা তা হলে যাই।’

‘আচ্ছা।’

আহসান খবর দিলো আহসান উল্লাহ হলের তিনজন ছাত্রকে খেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। মামা থাকতেন আহসান উল্লাহ। দু-জন একই হোস্টেলের রুমশেট হিসেবে দু-বছর কাটানোয় সম্পর্কটা ছিল বন্ধুসুলভ। দু-জনেই সস্তা ধরনের রসিকতা উৎসাহের সঙ্গে নিঃসংকোচেই বলাবলি করতাম। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি যে মামা এটি তার মনে পড়ে যেত। অভিভাবকসুলভ গান্ধীর্যে খোঁজ-খবর নিতেন আমাদের। ছাত্র খেফতারের কথা শুনেই মনে হলো তিনজনের একজন মামা রুলুল আমিন* নয়তো! তিনটার দিকে খোঁজ নিতে বেরলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি সত্যি যদি তাই হয় তবে উত্তেজনার একটা খোরাক পাওয়া যায়। ফলাও করে গল্প করতে পারি।

* হুমায়ূন আহমেদকে তার ছোটো ভাইবোন দাদাভাই বলে ডাকত।

* মামা এবং সহপাঠী

সামান্য ব্যয়সহায় হওয়ার আশা প্রকাশ্যে উল্লেখ দিতে
 পারিনিলাম না। তার সুভাব অনেকটা সেই জাতীয়
 কৈশবেদের মত মাঝে মাঝেই অন্য এক নিজস্বের এই বলে
 প্রবেশ দেয় যে সমাজকে যৌথিত্ব কাঙ্ক্ষিত কোন
 দোষ নেই। তিনি কোন রাজনৈতিক মতামতে জড়িত
 নন। অথচ একটি রাজনৈতিক পন্থা থেকে
 বিলাকমন করে হয় সকলের মতামত। বিভিন্ন বিভিন্ন
 পরামর্শ করেন না অথচ সব মিনতির মতামত
 থাকি থাকে নাতে সামনে একটা দাঁড়ান যে কোন
 দিক থেকেই বিপদ জামলে পঙ্গুর পাড় হতে
 পারেন। অথচ দেখা গিয়েছে এই জাতীয় লোক
 কুমিল্লাই সবকিছু আশে বিপদে পড়ে সমস্ত সমস্ত
 আশ্রয়। এতিনে তীব্র এই তরী বোঝায়।

গিন্দে দেখি ঠাণ্ডা হলে লম্বা
 ধরোয়া পড়ছেন। অথচ হল। উঠে বসে জামার
 দিকে চেয়ে বসে চান চা খেতে খেতে আমায়
 হবে। চান চুপক দিতে দিতে মজা বললেন
 কাল আমায় উপর দিনে বৃ বিপদ গেছে। মেলিটরী
 র জড়া খেয়ে কম করে হলেও বদল নাটক দৌড়ি।
 হামায় হুটের বাড়ী লেগে দেখা নখের কমলা।

হলে চিন্তে এসে শুনি কামের হুট করে
 দেখা হলে। প্রচীত খালক পরই নিচ
 পাকটো আর আকির পুরের দিক থেকে গুলি
 কাম কাম দেখা পাগল। অথচ ইকবাল এখানে
 দেখে নি। হলে হুট বন্ধ করে দেওয়া হল।

মামার গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। তার স্বভাব অনেকটা সেই জাতীয় বৈষ্ণবদের মতো যারা মুরগি খায় এবং নিজেদের এই বলে প্রবোধ দেয় যে গঙ্গাজলে রেঁধেছি কাজেই কোনো দোষ নেই। তিনি কোনো রাজনৈতিক মতবাদে জড়িত নন। অথচ একটি রাজনৈতিক সংস্থা থেকে ইলেকশন করে হলো সংসদের মেম্বার। মিছিল-টিছিল সমর্থন করেন না অথচ সব মিছিলের মাঝামাঝি থাকেন যাতে সামনে এবং পিছনে যে-কোনো দিক থেকেই বিপদ আসলে পগার পার হতে পারেন। অথচ দেখা গিয়েছে এই জাতীয় লোকগুলোই সবার আগে বিপদে পড়ে। সযতনে সমস্ত ঝামেলা এড়িয়ে তীরে এসে তরী ডোবায়।

গিয়ে দেখি মামা উপুড় হয়ে শুয়ে ঘরোয়া পড়ছেন। আশাভঙ্গ হলো। উঠে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল 'চল চা খেতে খেতে আলাপ হবে।' চায়ে চুমুক দিয়ে দিতে মামা বললেন, কাল আমার ওপর দিয়ে বড়ো বিপদ পড়েছে। মিলিটারির তাড়া খেয়ে কম করে হলেও দেড় মাইল দৌড়েছি। রাস্তায় ইটের বাড়ি লেগে দেখ নখের অবস্থা।

হলে ফিরে এসে শুনি শহরে হঠাৎ করে curfew দেয়া হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পরই নিউ মার্কেট আর আজিমপুরের দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যেতে লাগল। অথচ ইকবাল এখনো ফেরেনি। হলের গেট বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে হলের ভিতরই ঘোরাফেরা করতে লাগল। সন্ধ্যা হলো, রাস্তাঘাট যা নজরে পড়ে তা জনমানবহীন। হলের মেইন সুইচ অফ করে দেয়া হলো। আলোতে হলের লবিতে দাঁড়ানো ছেলেদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে যদি গুলি ছুঁড়ে এই ভয়ে। আমি ইকবালের জন্যে উদ্দিগ্ন বোধ করছিলাম। একবার ভাবি তার বন্ধু খাজার কাছেই আছে হয়ত। আরেকবার ভাবি হয়ত মামার কাছে গিয়ে আটকা পড়েছে। রেডিওর খবর শুনতে গেলাম নিচে। গুলির শব্দ এবার খুব কাছেই শোনা গেল। দমকলের গাড়িগুলো চং চং করে ঘণ্টা পিটতে পিটতে যাচ্ছে। Ambulance এর গাড়িগুলো যাচ্ছে তারস্বরে সাইরেন বাজাতে বাজাতে। একটি ছোট হঠাৎ বলে উঠল কার্ফিউ দিয়ে মেয়েদের হলে যদি মিলিটারি চুকে পড়ে তবে কিছ্র করার কিছু নেই। শেফুর কথা মনে হতেই বুকটা ধ্বক করে উঠল। সত্যি তো গত আন্দোলনে এমনি দু-একটা ঘটনা ঘটেছিল। কার্ফিউ আওয়ারে মিলিটারি অনেক ভদ্র বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়েছিল। উৎকণ্ঠায় পাথর হয়ে নিজের ঘরে এসে দেখি ইকবাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চাবি সঙ্গে না থাকায় ভিতরে ঢুকতে পারছে না।

‘কাফিরের ডিভর আসলি কি করে?’ অথাক বহু
জিজ্ঞাসা করি।
‘আলি কাফিরের আশেই এসেছি। নীচে মাঝে
গলে পল্লী করছিলাম।’
দুঃখিতা থেকে সঙ্গুণ খুঁজা বহু অডহাইসের
Pig have wingক পাত্তে নামনাম হোমসহাতি
আলিহে। পাকের কমে যাজি বেগে জনটাই
শ্রীজ খেলা হুখিল অর হে টে আর নীচ
থেকে উত্তেজিত রাজনৈতিক আলোচনায়
আওমাজেও আমার পাঠে বিজ্ঞ উপস্থিত হলো
না।

বাত যারোটায় থেকে নীচে প্রবল
উত্তেজনার আভাস উপলব্ধ। হে টে হুখী
সংব্রষ্ট দৌড়াইতে, ডাকার ডাকার চিকার।
আলি গ্রহেই বাইবে বহুইনে আমি। বাহেদার
নামাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা।
‘আবে দুমি, নীচে মাও দেখা গিয়ে শাস্ত’
দৌড়ে নীচে গিয়ে আলি হুডস্থ। দুজন
মোককে মোকোতে স্থইনে বাখা হুইনে
বুকে মেমে ডেমে যাচ্ছে। গাম্বুলোনে
অন্য ফুলবা পাগলের মত টেলিফোন করছে।
খবরে জানতে পারলাম এটা একজন

‘কার্ফিউর ভিতর আসলি কী করে?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

‘আমি কার্ফিউর আগেই এসেছি। নিচে মামুনের* সঙ্গে গল্প করছিলাম?’

দুঃশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অডহাউসের Pig have wing পড়তে লাগলাম মোমবাতি জ্বালিয়ে। পাশের রুমে বাজি রেখে কনটাঙ্ক ব্রিজ খেলা হচ্ছিল তার হইচই আর নিচ থেকে উত্তেজিত রাজনৈতিক আলোচনার আওয়াজেও আমার পাঠে বিঘ্ন হলো না।

রাত বারোটার দিকে নিচে প্রবল উত্তেজনার আভাস পেলাম। হইচই ভীত সন্ত্রস্ত দৌড়াদৌড়ি, ডাক্তার ডাক্তার চিৎকার। আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি। বারেন্দায় নানাজি মুজিবুল ইসলামের** সঙ্গে দেখা।

‘আরে তুমি, নিচে যাও দেখা দিয়ে কাণ্ড’ দৌড়ে নিচে গিয়েতো আমি হতভম্ব। দু-জন লোককে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে, রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। অগ্নিবুলেপের জন্য ছেলেরা পাগলের মতো টেলিফোন করছে। খবরে জানতে পারলাম এরা একজন

* মো. মামুন, পরবর্তীকালে অর্থনীতির অধ্যাপক।

** দূর সম্পর্কের নানা, একজন মুক্তিযোদ্ধা।

চিঠোগাণ্ডে বেসুবেস্টের বহু অন্যতম বিকশাণ্ডানা।
 কাশিও ব্রেক করতে গিয়ে একজন ব্লকে অন্যতম
 পান্ডে মূলি দেখেছে। যারা তাদের বনে
 এনেছে যারা ইষ্টনিভানিষ্টেই ছাত্র। এ্যাম্বুলেন্স
 এনে অনেক পর, লোকদুটিকে নিয়ে চলে গেল
 আইবুর বাজাণ্ডে বাজাণ্ডে।

কাশি চাচল ডোর ৯টা। দাঁড়ে
 সোলাম ব্রোকেশা ধলে। সোলামে সোটেবু কাচে
 খুব উড়। সবাই এমেছে আস্থায় সৃজনের খোঁজ।
 ধল থেকে পারিচিট্রী দেব সারিয়ে নিত।
 মেসেবুয়া বিবর্ন মুখে ধল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।
 দেদখলাম কোম্বুর অধিক মাহমেত্ত চাঁড় খোমেছে।
 মে নিজা থেকেই ধল চল বামামু চল যাঁই।
 চিক ধল পর বিকেলে ঢাকা ছাড়ব।
 তার সঙ্গে ওদের কয়েকজন হলেমু যাবে।
 তাদের সঙ্গে কোন অভিভাবক নেই। তারা
 চাঁদপুরে নেমে যাবে।

প্রান্তে সোলামেয়াগ বিদ্বিষ্ট হস্তায় বামা
 হস্তকে টাঙ্গা নিলে বামা থেকে দকট আচন নি।
 নিজেদের সাক্ষিত পুঁজিও লেব। অগ্নি জিনিস পর
 গোছ সাদু করছি বেসুয়া এমে অসু দিনা নীচে
 আপনার একজন সোস্ট এমেছেন, মেসে হামট।
 কোম্বু ছাত্রা কে তার হবে। নীচে মেলে দমজি
 আমায় ব্রাম মেট 'ছাত্র'।

চিটাগাং রেস্টুরেন্টের বয় অন্যজন রিকশাওয়ালা। কার্ফিউ ব্রেক করতে গিয়ে একজন বুকে অন্যজন পায়ে গুলি খেয়েছে। যারা তাদের বয়ে এনেছে তারা ইউনিভার্সিটিরই ছাত্র। অ্যামবুলেন্স এলো অনেক পর, লোক দু-টিকে নিয়ে চলে গেল সাইরেন বাজাতে বাজাতে।

কার্ফিউ ভাঙল ভোর ৯টায়। দৌড়ে গেলাম রোকেয়া হলে। সেখানে গেটের কাছে খুব ভীড়। সবাই এসেছে আত্মীয় স্বজনের খোঁজে। হল থেকে পরিচিতদের সরিয়ে নিতে। মেয়েরা বিবর্ণ মুখে হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

দেখলাম শেফুর অবিচল সাহসেও চিড় ধরেছে? সে নিজ থেকেই বলল, চল বাসায় চলে যাই। ঠিক হলো পঞ্চদশ বিকেলে টাকা ছাড়ব। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন মেয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে কোনো অভিভাবক নেই। তারা চাঁদপুর পৌঁছানো যাবে।

সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বাসা থেকে টাকা নিয়ে কেউ আসে নি। নিজেদের সম্বন্ধে পুঁজিও শেষ। আমি জিনিসপত্র গোছগাছ করছি বেয়ারা এসে খবর দিলো নিচে আপনার একজন গেস্ট এসেছে, মেয়ে গেস্ট। শেফু ছাড়া কে আর হবে। নিচে নেমে দেখি আমার ক্লাসমেট 'ছাগী'।*

* প্রকৃত পরিচয় জানা যায়নি।

তার ছাসী মাসটির একটু ইতিহাস আছে। ছাসী মাস
 মা পায়ে তাঁর চিরিয়ে দেয়া। শুকনে চটিজুতা থেকে
 অনেক বই নিয়ে তার কাছে সমান দিয়ে। এই মেয়েটি
 সুভাষা ভেমন। সে যে কোন ছুতোয় সে কোন
 বইয়ের সঙ্গে আলাপ করবেই। মেয়েদের সঙ্গে
 তার কোন আতির নেই তার মত বইসাহে ছেলেদের
 নিয়ে। আমাদের ক্লাসের নিজস্ব ত্যাগস্বীকার
 ছেলে সফিক মেদিন এবং টেট্টের মাটপড়ে
 এমেছির মেদিন মেয়েটি তার মাটে হাত দিয়ে কাপড়
 পরাড়া করলে করলে তিরোম করেছিল কি টেট্ট
 পাকিস্তানী না জাপানী? আকাশ ছেলেরা সবাই তাকে
 এতিয়ে চলেতে চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে আফি
 কাশন জনশিয় 'ছাসী' মাসি আমায়ই দেখা
 এবং হুমহিনাও এতিয়ে চলেতে জানেন।
 'সুন্নাত আমায় বিয়ে না দিয়েই চলে যাচ্ছেন?
 ছুতো মাসি সে আফি বললাম
 'হ্যাঁ কোথেকে সুন্নাত?'
 'আপনার বোনের কাছ থেকে। আচ্ছা আপনি কি বিয়ে
 শাবেন?'
 'হ্যাঁ পিরোজপুরে'
 'আমি কুর্দিয়া মাঝে এদিকে তুলে আসার কথা। অবশ্য
 মনোহর থেকে বাসে যাওয়া শাস্ত। তুলনা থেকে
 মনোহর পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। আচ্ছা
 পিরোজপুর থেকে তুলনা কতদূর?'
 'বেশী দূর না কতদূরই।'
 আচ্ছা আফি যদি আপনারদের সঙ্গে মাঠে আপনারদের

তার ছাগী নামটির একটু ইতিহাস আছে। ছাগল যেমন যা পায় তাই চিবিয়ে দেখে। শুকনো চটিজুতা থেকে অঙ্ক বই সবই তার কাছে সমান প্রিয়। এই মেয়েটির স্বভাব তেমনি। সে যে কোনো ছুঁতোয় যে-কোনো ছেলের সঙ্গে আলাপ করবেই। মেয়েদের সঙ্গে তার কোনো খাতির নেই তার যত উৎসাহ ছেলেদের নিয়ে। আমাদের ক্লাসের নিতান্ত ভ্যাবাগঙ্গারাম ছেলে সফিক যেদিন নতুন টেট্রনের শার্ট পরে এসেছিল সেদিন মেয়েটি তার শার্টে হাত দিয়ে কাপড় পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করেছিল কি টেট্রন পাকিস্তানি না জাপানি? আমরা ছেলেরা সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে আমি, কারণ জনপ্রিয় ‘ছাগী’ নামটি আমারই দেয়া এবং ভদ্রমহিলাও এটি ভালো করে জানেন।

‘শুনলাম আপনি পরীক্ষা না দিয়েই চলে যাচ্ছেন?’

মুখে হাসি টেনে আমি বললাম

‘হ্যাঁ কোথেকে শুনলেন?’

‘আপনার বোনের কাছ থেকে। আচ্ছা আপনিও বরিশালে যাবেন?’

‘হ্যাঁ পিরোজপুরে।’

‘আমি কুষ্টিয়া যাব। এদিকে রেল আবার বন্ধ। অবশ্য যশোহর থেকে বাসে যাওয়া যায় খুলনা থেকে যশোহর পর্যন্ত বাসসার্ভিস আছে। আচ্ছা পিরোজপুর থেকে খুলনা কতদূর?’

‘বেশি দূর না, কাছেই।’

‘আচ্ছা আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যাই আপনাদের

'অসুবিধা হবে? খুলনা পর্যন্ত যেতে পারবেন? ~~কিন্তু~~
অসুবিধা হবে না, খুলনার অফিসের এক গাড়ি থাকবে?
আজি জামতা ফোনটা করি -

'আজি সেইদিনই চলে যাবে। শুধু একজন বোকো দেবে
খুলনা পর্যন্ত।'

'কেনো আসেন আসেন?'

'আজি মনে করুন রাস্তার কোন অসুবিধা হলে মাকে
আমার পিছনে পুঁতে দুই একদিন থাকি লাগে।'

'না অসুবিধা হবে না কিছু'

অসুবিধিত মেয়ে দেখে জামতা হেসে বা মনেহোক
হাসিলে তাকান পারেন কিছু আদর মর কল হবে না
বরুণ একটা বেকার হবে। বাসা ছোট এই একটা
অসুবিধা আমাদের নিজেদের ফুলোর না। চিক হলে
সে পয়সার ভাবে আমাদের মনে থাকে। মেকুর
কম নাথায় ফুলোর সেটি জানিলে দিনাল।

বাসায় বসনা মরার জগে পরীক্ষার্থী ৪/৩
জন মিলে চসমান head of the department এর
মনে দেখা করলে। স্যার বেক্তিরে এলেন। কান্দ
কান্দ মুখ ঠুঁদখাত চসমান। মতে বললেন।
পা: কুচিত ভাবেই বসমান স্যার করণ কর্ত
বললেন - শুনেই হারি হুং তামাদের Department
থেকে বস দামা chemicals কাল বাতে একদিন
ছেলে জকতি করে মিলে মিলেছে। ঘটনাট
জানতাম না কাজে মিলি হলাম।

অসুবিধা হবে ? খুলনা পর্যন্ত যেতে পারলেই হবে, খুলনায় আমার এক খালু থাকেন।’

আমি আমতা আমতা করি—

‘আমি সেইদিনই চলে যাব। শুধু একজন লোক দেবেন খুলনা পর্যন্ত।’

‘বেশত আসেন আসেন?’

‘আর মনে করেন রাস্তায় কোনো অসুবিধা হলো যাতে আমার পিরোজপুরে দুই একদিন থাকা লাগে।’

‘না অসুবিধা হবে না কিছ?’

অপরিচিত মেয়ে দেখে আশ্মা হয়ত বা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন কিন্তু আদর যত্ন কম হবে না বরংচ একটু বেশিই হবে। তবে বাসা ছোটো এই একমাত্র অসুবিধা আমাদের নিজেদেরই কুলোয় না। ঠিক হলো সে পঞ্চদিন ভোরে আমাদের সঙ্গেই যাবে। শেফুর রুম নাম্বার জানত না সেটি জানিয়ে দিলাম।

বাসায় রওনা হবার আগে পরীক্ষার্থী ৪/৫ জন মিলে গেলাম Head of the department* এর সঙ্গে দেখা করতে। স্যার বেরিয়ে এলেন। কাঁদ-কাঁদ মুখ উদ্ভ্রান্ত চেহারা। বসতে বললেন। সংকুচিত ভাবেই বসলাম। স্যার করুণ কণ্ঠে বললেন— ‘শুনেছ বোধ হয় তোমাদের Department থেকে বহু দামি chemicals কাল রাতে একদল ছেলে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে।’ ঘটনাটা জানতাম না কাজেই বিস্মিত হলাম।

* রসায়ন বিভাগীয় অধ্যাপক মোকাররম হোসেন।

'chemicals নিশ্চয় ওরা কি করবে স্যার?'
 'না না নিশ্চয়ই তা বদলে মনে হাট্টে এক্সপ্লোজিভ কোন
 তৈরি করবে। তবে সন্দেহ জন্মাবে সব দামী দামী
 chemicals নিশ্চয়ই মার কোর দরকারই হবে না।
 আমরা এত কষ্টে জোসাটু করা chemicals,
 প্যারের মুখ করুন হলে ঠিক। সমস্তই মুখ
 করুন হলে ঠিক। আমরা তাই বলে বলবো, কিছু একটা
 হবে। আমরা মনে একটা পক্ষি পাখি স্থানে
 হ্যানবেস্টের কাছে আছে। সব সমস্ত তুলে তুলে
 আছি।

আমরা পরীক্ষার কথাতে আসলেই বলবো -
 নিরাপদ জানুসায় মেতে চাচ্ছি মাত। সব ঠিক না হলে
 পরীক্ষা হবে না। পরীক্ষায় জন্ম দেবো না।
 কথা শুনে মনে শুন তিনি বলবেন বড় কোন ভয়
 ভাব। আমরা বেড়িয়ে আসতে স্যার হাট্টে
 হাট্টে গোট পরীক্ষা জন্ম হবে। কি ভাবছিলেন তিনি
 কে বলবে।

চারিদিকে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু একটি
 কোথা সাহেব জারিকে তবুস কোর্সে জন্ম দেবেন।
 না জানি কি দেন না জানি কি বলেন। ঠিকই
 মনুষ্য পরিমিত। আছে। অহরহের কাগজগুলি জাহানের
 মত তেজতে আছে। এদিকে সাময়িক জাহান
 প্রকাশক হলে এলেন Lt. Gen. টি. জি। হুইটস্টার
 মার্চে যোগ্য বসন করে মিনি ইন্ডিয়ানেই বিজ্ঞানিক
 নামক হলে বুঝেছেন। জাহান মনে উত্তেজনা পাশের
 হলে মনে হবে। এদিকে বহুমানী বিজ্ঞানী একটা কামোনা

‘chemicals নিয়ে ওরা কী করবে স্যার ?’

‘যা যা নিয়েছে তা দেখে মনে হয় হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা তৈরি করবে। তবে সঙ্গে আরো সব দামি দামি chemicals নিয়েছে যার কোনো দরকারই হবে না। আমার এত কষ্টে জোগাড় করা chemicals’—স্যারের মুখ করুণ হয়ে উঠল। অস্পষ্ট ভাবে বললেন, ‘কিছু একটা হবে। আমার মেয়ে একটা পশ্চিম পাকিস্তানে হ্যাসবেন্ডের কাছে আছে। সব সময় ভয়ে ভয়ে আছি।’

আমরা পরীক্ষার কথাতে আসতেই বললেন—‘নিরাপদ জায়গায় যেতে চাচ্ছ, যাও। সব ঠিক না হলে পরীক্ষা হবে না। পরীক্ষার জন্যে ভেবো না।’ কথা শুনে মনে হলো তিনি বলেছেন বড়ো কোনো ভাবনা ভাবো। আমরা বেরিয়ে আসলাম। সন্ধ্যা হাঁটতে হাঁটতে গেট পর্যন্ত আসলেন। কী ভাবছিলেন তিনি, কে বলবে।

চারিদিকে তখন আলোরহীন বিষয়বস্তু একটি— শেখ সাহেব ৭ তারিখে রেসকোর্সে ভাষণ দেবেন। না-জানি কী দেন না-জানি কী বলেন। উৎকর্ষায় শহর বিমিয়ে। খবরের কাগজগুলি আগুনের মতো তেতে আছে। এদিকে সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে এলেন। Lt. gen. টিক্কা। ঈদগার মাঠে বোমাবর্ষণ করে যিনি ইতিমধ্যেই বিভীষিকার নায়ক হয়ে রয়েছেন। ছাত্ররা যেন উত্তেজনায় পাগল হয়ে যাবে। এদিকে বাঙালি বিহারি একটা ঝামেলা

প্রায় সপ্তকে উঠেছে। কোথা সাথের ইমক দিনেরন-
 'ভাষা শেখি হোক, বাংলা হদকো শেখি বাস
 করবে দেশে বাসিন্দা। তাদের জ্ঞান জ্ঞান
 আমাদের কাছে এক পবিত্র জগতরতা'
 কামেলা জা থেকে পেল বটে কিছু বিহারীর ইমক
 লীগল।

ঢাকা থেকে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে আমি অর্ধশত
 ধরে উঠছি। বামা থেকে কোন খবর নেই। ~~কিছু~~ ~~কেনে~~
 নতুন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেও এদিকে ঢাকা
 সড়কসাল। স্থপ্তি আমবা জির জনই বই কেনো যোন
 জিঞ্জু কুনিঞ্জা। ২০বিদা বিদ্যালয়তনের যেড মিসট্রেস
 এও বামা থেকে পড়াশুনা করছে। ১.৬.৫ পরীক্ষার
 প্রস্তুতি। তার জন্যে চিন্তা। ~~কিছু~~ মনে কথা বলার
 জন্যে তোলাম Telephone Exchange এ। সে সময়ে
 আছে সেখানে Telephone নেই তবে কাছেই তার
 বাসার বাসা। সেখানে তাদের টেলিফোন
 নাম্বার জানা ছিল। গিয়ে দেখি জেঁ জেঁ Telephone
 exchange খালি। মনস্তই বন্ধ। অর্থ essential
 service হিসেবে এটা খোলা থাকার কথা।

কেনা দুটোর দিকে হলেও সামনে আমি
 আর ইকবাল বিকলা নিয়ে দাঁড়ানাম। ইকবাল সেজন
 কামের খোঁজে। গিয়েছে গিয়েছেই কোথায় দেখা
 নেই। পাঁচ মিনিটে দশ মিনিটে করে আর্টস্টা পাও
 হল। সখচ লক্ষ ছাড়বে গোটা চারেকের দিকে। মখন

প্রায় পেকে উঠছে। শেখ সাহেব ধমক দিলেন—

‘ভাষা যাই হোক, বাংলাদেশে যে-ই বাস
করবে সেই বাঙালি। তাদের জান-মাল
আমাদের কাছে এক পবিত্র আমানত।’

ঝামেলাটা থেমে গেল বটে কিন্তু বিহারিরা ফুঁসতে লাগল।

ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠছি। বাসা থেকে কোনো খবর নেই। শেফু মেয়ে, নতুন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে— এদিকে ঢাকায় গণ্ডগোল। শুধু আমরা তিনজনই নই, মেজে বোন শিখু* কুমিল্লায়। ফরিদা বিদ্যায়তনের হেডমিসট্রেস-এর বাসায় থেকে পড়াশুনা করছে। এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি। তার জন্যেও চিন্তা। শিখুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে গেলুম Telephone exchange-এ। সে যেখানে আছে সেখানে Telephone নেই তবে কাছেই তার বান্ধবীর বাসা। সৌভাগ্যক্রমে তার টেলিফোন নাম্বার জানা ছিল। গিয়ে দেখি ভোঁ ভোঁ Telephone exchange খালি। সমস্তই বন্ধ। অথচ essential services হিসেবে এটা খোলা থাকার কথা।

বেলা দুটোর দিকে হলের সামনে আমি আর ইকবাল রিকশা নিয়ে দাঁড়িলাম। ইকবাল গেল শেফুর খোঁজে। গিয়েছে তো গিয়েছেই, শেফুর দেখা নেই। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করে আধঘণ্টা পার হলো। অথচ লঞ্চ ছাড়বে গোটা চারেকের দিকে। যখন

* মেজো বোন মমতাজ শহীদ।

স্বৈর্ভোগের বাঁধি প্রায় ভেঙে পড়ছে তখন দেখা গেল
 পোষু হাসতে হাসতে এসেছে, চোট পর্যন্ত এসেই
 বিদায় কোন কথা না বলেই। রাগে স্বপ্নন চম
 গোমার তুল দ্বিতলে হাঁখে হাখে তখন সে নেমে
 এল। গলে তিনটি মেয়ে তারা তিন জনই চাঁদপুর
 মাঝে। বাবা লক্ষ্য খাটে খেতে জারি মাইল, তার তিন
 জন মাঝে রাগের তরুর জিন্দেই। আশ্রয় দমা
 চায়ের দেখা নেই। জিভেন করমান

কি বে পোষু আমাদের ক্লাসের কারো সঙ্গে দেখা
 হৈছিল ?

‘না’

‘কিন্তু বলছিলেন ?’

‘না’

উম্মিনেলে পৌঁছে দিয়া লক্ষ্য এই দ্বায়েত এই
 ছাড়ে। তাহা পড়া পুর ঠিকানা। তিন স্বরূপের
 জাম্বুনা নই। কিছুনা তু না হু কোন মতে সের
 কিছু মেয়েবা? সবাই পাল্লাখে ঢাকা থেকে।

কোয়ু কোন্ কোন্দো হুমে হটাৎ বলল, ‘আর দুটি
 মেয়ে কই?’ সজিত ইটি উটি করে খুঁজি
 চাষিদি। সুই করছে কাঠকোঁ দেখা যাচ্ছেনা।

‘আমি, আমি একা কি করে বাসামু মাঝ’
 সজি তমসোঁ কেঁদে খেলে জারু কি। সজিত
 বাত এগাবোটা পৌঁছেবে চাঁদপুর এই তমসোঁ
 একা একা কি করবে। মিটি বাজিনে লক্ষ্য ছেড়ে

ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে পড়ছে তখন দেখা গেল শেফু হাসতে হাসতে আসছে, গেট পর্যন্ত এসেই বিদায়, কোনো কথা না বলেই। রাগে যখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। তখন সে নেমে এলো সঙ্গে তিনটি মেয়ে। তারা তিনজনই চাঁদপুর যাবে। বাসা লঞ্চঘাট থেকে আধমাইল, তারা তিনজন যাবে কাজেই ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহর দয়া, ছাগীর দেখা নেই। জিজ্ঞেস করলাম

‘কিরে শেফু আমাদের ক্লাসের কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল?’

‘হু।’

‘কিছু বলেছিল?’

‘না।’

টার্মিনেলে পৌঁছে দেখি লঞ্চ এই ছাড়েতো এই ছাড়ে। তাড়াহুড়া করে উঠলাম। তিল ধারণের সময় নেই। ছেলেরা তবু না হয় কোনোমতে গেল কিন্তু মোমেনা? সবাই পালাচ্ছে ঢাকা থেকে। শেফু কাঁদো কাঁদো হয়ে হঠাৎ বলল, ‘আর দুটি মেয়ে কই?’ সত্যিতো ইতিউতি করে খুঁজি চারিদিক। ধু-ধু করছে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ‘আমি, আমি একা কি করে বাসায় যাব’ সঙ্গী মেয়েটি কেঁদে ফেলে আর কি। সত্যিতো রাত এগারোটায় পৌঁছবে চাঁদপুর, এই মেয়ে একা একা কী করবে। সিটি বাজিয়ে লঞ্চ ছেড়ে

দিন। বাকু জম্বু দিন - 'আপা অজাদেবু বাসাম'
চলন। মেখান থেবে লোক দিয়ে' আপনাকে পাটখান'

কেবিলে পালো হাঁটা বাসাম একটা চাদর
বিধিয়ে মেখা গেল। আমতা দু'জনে কোরমতে
এঁটে বসানো হসখানে। মেমুদেবু বসায় সমাধীনঃ
হলে চল জান অবৈধ। কেবিলে বসি জড়নোকেরা
উমাছোত ইয়েই মেমুদেবু জাহদেবু কেবিলে ডাকলো।
একটা আও শানেবু জরুখু লাজুক মেমু নুং মে
দেলেদেবু কেবিলে ডেকেছে বলে পঞ্জাম' হয়ে যাবে।
ইউনিভার্সিটির কক ককে মেমু হামতে হামতেই
কেবিলে দুকে পড়ল। মেখান মেখানো দুজন এঁটে
উপায়েই কেবিলে আশ্রম' মেমুদিন। কাজে কাজেই
সম্মা 'উক', হামাহামি' হল। গন খন চা আও
বিমকুটে অমসলে'। বসি বাখলু জড়নোকেরা উদার
হলে খবুচ ক' লামলেম এও মেমুদেবু অতি
পাহান) বুমিকগাম' হেনে সড়াগাট্টে থেতে লামলেম।

আমি বাঁচবে বচম এদেবু সম্মা
কুনজি। জালজোরু শায়া সড়াতে সড়াতে বাছী-
সম্মা মেখান থেবে সোনারু দাম, সোনারু দাম
থেবে দেভোরু অকম্মা, দেভোরু অকম্মা থেবে
বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। এই
অভিজ্ঞতার একটি সম্মা চমৎকার লামলো। সম্মাটির
কথক 'চিফ' বিশ্বাস মোস) নুং জ' হেন' ইউনি-

দিলো। শেফু অভয় দিলো— ‘আপা আমাদের বাসায় চলেন। সেখান থেকে লোক দিয়ে আপনাকে পাঠাব।’

কেবিনের পাশে হাঁটার রাস্তায় একটা চাদর বিছিয়ে ফেলা গেল। আমরা দুভাই কোনো মতে এঁটে বসলাম সেখানে। মেয়েদের বসার সমাধানও হয়ে গেল ভালোভাবেই। কেবিনে-বসা ভদ্রলোকেরা উৎসাহিত হয়েই মেয়েদের তাদের কেবিনে ডাকল। এরাতো আর গ্রামের জবুথবু লাজুক মেয়ে নয় যে, ছেলেদের কেবিনে ডেকেছে বলে লজ্জায় পড়ে যাবে। ইউনিভার্সিটির ঝকঝকে মেয়ে হাসতে হাসতেই কেবিনে ঢুকে পড়ল। সেখানে আরো দু-জন এই উপায়েই কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিল। কাজে কাজেই গল্প শুরু, হাসাহাসি শুরু হলো। ঘন ঘন চা আর বিসকুট আসতে লাগল। বলাবাহুল্য ভদ্রলোকেরা উদার হস্তে খরচ করতে লাগলেন এবং মেয়েদের অতি সামান্য রসিকতায় হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

আমি বাইরে বসে এদের গল্প শুনছি। আলাপের ধারা গড়াতে গড়াতে শাড়ি-গয়না সেখান থেকে সোনার দাম, সোনার দাম থেকে দেশের অবস্থা, দেশের অবস্থা থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার একটি গল্প চমৎকার লাগল। গল্পটির কথক ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয় সে ইউনি-

জাতির সঙ্গেই বিশ্বের সঙ্গে university তে পাঠাটা
 আমাদের কাছে একটা দামী সন্ধান। সন্ধান যেমন
 রূপ লাভন্য বৃদ্ধি করে বলে শ্রীনা, universityর ছাটী
 এই ছাপটা তেমনি মেয়েদের স্বার্থে একটা আনন্দ
 সৌন্দর্য এনে দেয় বলে এদের বিশ্বাস। আমাদের আমল
 সালের ১০ দামী প্রজন্মের আত্মা তে নিজেদের
 কাছে পর্যন্ত আঁকুর। ছেলেদের সঙ্গে মিছিলে যোগ
 দিতে যাত্রা ভীষণ উৎসাহী। উৎসাহীটা অবশ্যই নিজেকে
 বিক্রয়িত করার জন্যে মে ছেলেটা আনন্দে কেমর
 পুনর্জীবিত কেমর ওমাগাঙা ছেলেদের সঙ্গে
 মিশেছি। সন্তান, এই রূপ

আমি মেমিটারের সত কিছু দিনের ইতিহাস শুনি
 বসনে জায়ত হুয়েছে তাদের প্রত্যেকের এক্সিয়াত
 জড়িতত নেবার জন্যে প্রত্যেকের হলের কমেবস্তার
 মেয়ে মিলে হাসান মিলে গেল। মেখানে অনেক
 বুনেট বিক্রয় পকে আছে। মেয়েটা প্রত্যেকের কাছে
 মাঝে, শাবুনা মাঝে এবং বনাছে তাদের খাতা
 কিছু একটা মাঝে দিতে। ককটে দিচ্ছে ককটে
 জানাচ্ছে জাতি মিলেছে জানি না। যদি মোক
 প্রথমটা মেয়েটি তার খাতা নিলে একটি
 ছেলেবে কাছ দাড়া। দেওয়াই মনে হচ্ছে ছেলেটি
 মিছিলে সমত কোন ফলাফলের বা ফুলের
 ঠুঁ ক্রামের ছাত্র। গল্পা পর্যন্ত মাদা ছাত্রের ঢাকা।
 "দিন না আমার খাতা কিছু নিলে। কেমর
 আপনি মিছিলে এসেছিলেন, কি করে শুনি
 গাঙ্গল এই সব।"

ভার্সিটির সেই ধরনের মেয়ে University-তে পড়াটা যাদের কাছে একটা দামি-গয়না। গয়না যেমন রূপ লাভণ্য বৃদ্ধি করে বলে ধারণা, Universityর ছাত্রী এই ছাপটা তেমনি মেয়েদের মধ্যে একটা আলাদা সৌন্দর্য এনে দেয় বলে এদের ধারণা। যাদের আসল গায়ের রং বাদামি প্রলেপের আড়ালে নিজেদের কাছে পর্যন্ত আচ্ছন্ন। ছেলেদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে যারা ভীষণ উৎসাহী; উৎসাহটা অবশ্য নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার জন্যে যে, দেখো আমরা কেমন প্রগতিবাদী, কেমন অনায়াসে ছেলেদের সঙ্গে মিশছি। গল্পটি এই রূপ:

যারা মিলিটারির গত কিছু দিনের ইতস্তত গুলি বর্ষণে আহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অস্ত্রমত নেবার জন্যে রোকেয়া হলের কয়েকজন মেয়ে মিলে হাসপাতালে গেল। সেখানে অনেক বুলেটবিদ্ধই পড়ে আছে। মেয়েদের প্রত্যেকের কাছেই যাচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং বলছে তাদের খাতায় কিছু একটা লিখে দিতে। কেউ দিচ্ছে কেউ-বা জানাচ্ছে আমি লিখতে জানি না। যাই হোক সহযাত্রী মেয়েটি তার খাতা নিয়ে একটি ছেলের কাছে দাঁড়াল। দেখেই মনে হচ্ছে ছেলেটি শিক্ষিত হয়ত কোনো কলেজের বা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা।

‘দিন না আমার খাতায় কিছু লিখে। কেন আপনি মিছিলে এসেছিলেন, কি করে গুলি লাগল এই সব।’

ছেলেটি কোস কথা বলেনা। জুই তাকিয়ে থাকে। আমার
অনুভব করবে, 'দিন না একটা ফিটু লিখে' ছেলেটি
তুও নীতিব। এমন সময় নাম আসে বৈকালিক
আহার নিম্নে। টান দিলে চাদপুটি সরালে দেখা
শায় ছেলেটির ভল হাত ককি পর্যন্ত হাতে বাদ দেখা
হয়েছে মেথানে নিপুণ কালেক। দুঃখ ও লক্ষ্য
মেয়েটি পালিয়ে আসে।

সকল গণনা হাত হলে গেল। দুই চাঁদ
পুকে আসে দেখা মাঝে। চাঁদপুর মাটি মেয়েটির
পরে সলে আনয়িত উদ্বিগ্ন হোল। সময়টি ভিতর
হাত করেই। লক্ষ্যেই ইকালের বস্তু কমি বলাক
পুথানির সলে দেখা। সে হলে বুঝিয়া শুনা
টানপুর। ফিটু মফর হলে মেয়েটির সামনে
হামির করা হল একটা হল কোন ধর নেই
সে ~~কোন~~ আসাকে চাঁদপুরে বাসায় রেখে
তারপর মাঝে। মেয়েটির পুথ ফিটু জানলে
উদ্বিগ্নিত হওয়ার বদলে আবে মেন আমনি মেয়ে
গেল। বার বার জিজ্ঞাস করলে নামনা ছেলেটির
বড়ী কোথায়, কোথায় মাঝে ফি পড়ে। জন করে
তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির উদ্বিগ্ন
সময় কথায় খোঁজে পেলান। তার চেহারায় সব
মুনাভ বিলিপ্ততার বদলে নাটকীয় মুনাভ লিখিত
তার ছাপডাই প্রবল। মেট মেথ, পাচন টোট, ফিটু
কলক নাক সব লিলিয়ে এমন একটি হার-গা হু

ছেলেটি কোনো কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে। আবার অনুরোধ করে, 'দিন না একটা কিছু লিখে' ছেলেটি তবুও নীরব। এমন সময় নার্স আসে বৈকালিক আহার নিয়ে। টান দিয়ে চাদরটি সরাতেই দেখা যায় ছেলেটির ডান হাত কজি পর্যন্ত কেটে বাদ দেয়া হয়েছে সেখানে নিপুণ ব্যান্ডেজ। দুঃখ ও লজ্জায় মেয়েটি পালিয়ে আসে।

গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেল। দূরে চাঁদপুরের আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদপুর যাত্রী মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উদ্দিগ্ন হলাম। সমস্যাটি মিটল হঠাৎ করেই। লঞ্চেই ইকবালের বন্ধু কবি বলাকা মুখার্জির সঙ্গে দেখা। সে যাচ্ছে কুমিল্লা ভায়া চাঁদপুর। কিন্তু যখন তাকে মেয়েটির সামনে হাজির করা হলো এবং বলাকা হলো কোনো ভয় নেই সে আপনাকে চাঁদপুরে বাসায় রেখে তার সঙ্গে যাবে। মেয়েটির মুখ কিন্তু আনন্দে উদ্ভাসিত হওয়ার বদলে আরো যেন আমশি মেরে গেল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল। ছেলেটির বাড়ি কোথায়, কোথায় যাবে, কী পড়ে। ভালো করে তাকিয়ে চেহারার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম। তার চেহারায় কবি সুলভ নির্লিপ্ততার বদলে নাট্যকার সুলভ স্ফিগ্ততার ছাপটাই প্রবল। ছোটো চোখ, পাতলা ঠোঁট, কিঞ্চিৎ ঝুলন্ত নাক— সব মিলিয়ে এমন একটি ধারণা হয়

যে এই মাসে কিছু একটা অন্যায় করে পুলিশের
ডমে আত্মসোপান করে আছে। মাঠে হুগু হুগু
কাকা মেমেন্টোকে নিয়ে লেনে গেল। আমরা
খোলা হাতে পৌছিনাম ডোর পাঁচটা। সেখানে
স্তনি শেখ মুন্সির জাপানে সাম বাহিনী হরতান
চলছে।

খুশী মনেই হাঁটতে হাঁটতে বামায় পৌছিনাম।
সদর দরজা খোলা। দুকে দেখি দুটি পক্ষ
পাশে একত্রে কয়েক নম্ব বিধানা তৈরী করে সবাই
উঠে। আমরা সাহসিকতা দেখাতে উঠে মেদির ভেদ
আমাদের জনেই গুলি ছেলে মকালে। সবাইকে
দেখে ছেলে মানুসের মত খুশী হলে উঠলেন -

‘আরে দেখো কে এল এই উঠল’
আমরা উঠলেন। ^{আমরা} ^{নিমিত্ত} ^{স্বাধীন} খুশী মনে
ঢাকা কথা জিজ্ঞাস করলে পাগলেন। একটু পরে
পার্টী বললেন ‘মাক সবাই এসে গেছে,
হামার স্কুলের ^{আর} ^{ছাত্র} ^{নাই}। আর ওয় গাঁও।’
আমরা তার চিরচাষিত পুস্তক ^{আর} ^{আমরা} ^{উঠল}
বেড়িয়ে ছেলে দিলেন। তখন ^{আমরা} ^{আমরা}
পা দুমুখে ^{সিগারেট} ^{করুন} ^{আমরা} ^{আমরা}
চোখে ^{পানি} ^{এসে} ^{জিয়েছে}।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

যে, এইমাত্র কিছু একটা অন্যায় করে পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে আছে। যাই হোক বলাকা মেয়েটিকে নিয়ে নেমে গেল। আমরা ছলারহাটে পৌছলাম ভোর পাঁচটায়। সেখানে শুনি শেখ মুজিবের আহ্বানে যানবাহনে হরতাল চলছে।

খুশি মনেই হাঁটতে হাঁটতে বাসায় পৌছলাম। সদর দরজা খোলা। ঢুকে দেখি দুটি পালঙ্ক একত্রে করে মস্ত বিছানা তৈরি করে সবাই শুয়ে। আক্বা সাধারণত দেরিতে ওঠেন। সেদিন যেন আমাদের জন্যেই ঘুম ভেঙেছে সকালে। সবাইকে দেখে ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন—

‘আরে দেখো কে এসেছে, এই ঠাটো না’। আম্মা উঠলেন। আক্বা সিগারেট ধরিয়ে খুশি মনে ঢাকার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। একটু পরে পরেই বলতে লাগলেন ‘যাক সবাই এসে গেছে, হাজার শুকুর। আর ভয় নাই। আর ভয় নাই।’ আক্বা তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী চড়া ভল্যুমে রেডিও ছেড়ে দিলেন। শেফু যখন আক্বা আম্মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল তখন আনন্দে আক্বার চোখে পানি এসে গিয়েছে।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

৭ তারিখে আসক্তদের মত ওামর হল দেখা সায়েদের। তার
মেরি বিখ্যাত চাকুরীমতা পূর্ব কারের অধুর জামা

"..... আমি যদি তোমাদের কাছে না
যাচ্ছি তোমাদের উল্লর আমায় আদেশ
করুন, গ্রহের গ্রহের চূর্ণ গ্রহে ভাল, তোমাদের
না আমি আছে তাই নিজে প্রস্তুত হও, বৃত্ত
অধর দিতে চিত্তেছি আরো দের। বাতলাকে
পুত্র করে চাকুরী প্রসঙ্গায়....."

কাউকে ওম দেখাতে হল না, লোক কহতে হল না বহু
হলে সেরা সুল কলেজ কোর্ট কাছাড়ি সবকারী
বেসরকারী সমস্ত অফিসের তালি কুনল। স্বপ্ন মত
তোম সায়েদের অফিসে অসহায় আন্দোলনের
জাচে। মহায়ে বুরতে পারবে কত আসছে। বগদিখে
গণিত মনুত্রে বিকাশ জলমিকা হোলে উঠবে। মারি
দিনে এ টেকানো মারনা।

এদিকে ওম আর কহে না। প্রথম কটোর
জন্মে একটা উল্লর লিখে শুরু করলাম। অসহায়
প্রেমের উল্লর ভিত্তি করে নিতান্তই সহজ মনুল উল্লর
গ্রহ অসহায় কিছু মেরি, সমস্ত নীতি কার্য নীতির কো
সমস্যায় মেরি। লিখেতে লিখেতে দেখলাম পারিষ্কার
চরিত্র কলমে উঠে আসছে। উল্লরদের বাহার
চরিত্র হলে উঠল আমায় আবার চরিত্রের অসহায়।
নামকত দিলে, নামিকারায় পূর্ব একটা কল্পনার পুত্র

৭ তারিখে আগুনের মতো ভাষণ হলো শেখ সাহেবের। তার সেই বিখ্যাত চার দফা পূর্বশর্তের অপূর্ব ভাষণ :

‘... আমি যদি তোমাদের কাছে না থাকি তোমাদের উপর আমার আদেশ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও, রক্ত যখন দিতে শিখেছি আরো দেব। বাংলাকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্...’

কাউকে ভয় দেখাতে হলো না, জোর করতে হলো না বন্ধ হয়ে গেল স্কুল-কলেজ কোর্ট-কাছারি। সরকারি বেসরকারি সমস্ত অফিসেই তালা ঝুলল। শুধুমাত্র শেখ সাহেবের আইংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে। সবাই বুঝতে পারছে বাতাস আছে। বহুদিনের সঞ্চিত সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ফুলে উঠছে। বাধ দিয়ে এ ঠেকানো যাবে না।

এদিকে সময় আর কাটে না। সময় কাটানোর জন্যেই একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। অসফল প্রেমের ওপর ভিত্তি করে নিতান্তই সহজ-সরল উপন্যাস। মহৎ আদর্শ কিছু নেই, সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতির কোনো সমস্যাও নেই। লিখতে লিখতে দেখলাম পরিচিত সব চরিত্র কলমে উঠে আসছে। উপন্যাসে বাবার চরিত্র হয়ে উঠল আমার আন্নার চরিত্রেরই অনুলিপি। নায়কতো নিজেই, নায়িকারাও খুব একটা কল্পনার নয়

সময় কাটতে লাগল হু হু করে। ছোটোবোনের নামে দু-একটা কবিতাও লিখে পাঠালাম দৈনিক পাকিস্তানে। ছাপাও হলো। অসমাপ্ত পরীক্ষা, দেশের পরিস্থিতি সমস্তই আমার মন থেকে মুছে গেল। ঘাড় গৌজ করে অনবরত লিখে চলেছি। এক-একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়, সবাইকে পড়ে গুনাই। চলবে, মন্দ নয় এই জাতীয় মন্তব্যে উৎসাহেও ভাটা পড়ে না।

আব্বাও কিছুটা বিশ্রাম পেলেন। মফস্বলে মফস্বলে ঘোরাটা বন্ধ হলো। কাজের মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে খবর শোনা, অফিসের কাগজপত্র দেখতে দেখতে চা খাওয়া, মাঝে মাঝে Court-এ যাওয়া, দুপুরের দিকে অল্পকিছু খেয়ে একটু ঘুম বিকেলে বারান্দায় চেয়ার পাতা হতো। প্রাত্যহিক বৈকালিক প্রেসরের নিয়মিত সদস্য ছিলেন ডাক্তার সাহেব, কোর্ট ইন্সপেকটর সাহেব, SDPRO সাহেব। ঘনঘন চা পাঠানো হতো। আব্বা মেজাজে মানুষ, মেজাজে থাকলে ভালো গল্প করতে পারতেন, গল্প করতে ভালোও বাসতেন। তাঁর আসল উৎসাহ ছিল occultstudy-তে কাজেই সবরকম রাজনৈতিক আলোচনা শেষ হতো ভূত, প্রেত, জ্বিন, পামিস্ট্রি আর এসট্রোনমিতে এসে। এই আসরে রাজনৈতিক নেতারাও আসতেন। ন্যাপ মনোনীত প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী আলী হায়দার খান* তাদের মধ্যে অন্যতম। সে আব্বার বিশেষ

* পরবর্তীকালে বোন সুফিয়া হায়দারের স্বামী।

প্রিয় পাত্র ছিল। জনৈক কাপারেরে আত্মীয় তার উপর
নির্ভর করতেন। আত্মীয় বাসতে কাটত ৫০০ সাহেবের
বাসায়। জুলাইয়ের রাতে সিদ্ধি। আত্মীয় সঙ্গে তাঁর
কোনই মিল ছিল না। না চরিবে, না কামের বা
সুভাষের কিছু মিল ছিল আত্মীয়। "চিহ্ন থেকে
চিহ্ন দিয়েছে ছোট ভাই আপনি যদি জানতেন
তবে পাড় সুভাষায়।" "কখন চিহ্ন পাও পাও না
এই বড় আত্মীয় আপনি যদি জানেন তবে জনটা
একটু শালকা হয়।" "সুন্দর বন দেখতে মাঝ
আত্মীয় কয়েকজন পড়িয়ে পাড়িয়ে বসে
এসেছেন, আপনি যদি সঙ্গে আসেন।" এই
বাতীয়ে Taliphora আমত প্রায়ই।

যেচারা একা একা বরীক্ক সংসীতের
এক পাঁজা বেরকত দিনে আসিলেন আত্মীয়। বরীক্ক
সংসীতের অশ্রুতে ছেন না নিজেই সান
হালির তার আত্মীয় করে দিলেন। পিছিয়ে পুরে
স ভাল দুই পাড় দিয়ে না বাসা থেকে এক মেয়ে
এক মেয়ে দুই পাড়িয়ে আসলেন।

আসেই বনেছি আমাদের সমস্ত খুব
ভাল কাটছিল। অর্থাৎ এর অর্থ এই নয় হয় খুব
দে টে করে দিন কাটছিল। স্বাভাবিক যেমন কাটে
ভেননি। সন্ধ্যার পর বেড়াতে হয়তাম সবই মিলে।
বাসার জান পালা দিয়ে হয় বাসটা প্লানারহাট পর্যন্ত
সিহ্নেই সেই বাসটা পেরে টাটকাম। সি. সি. মসলিটাম,
টাটকাম কনিষ্ঠি পোড়িয়েও অনেকখুব খাওয়া হয়

প্রিয়পাত্র ছিল। অনেক ব্যাপারেই আঝা তার ওপর নির্ভর করতেন। আঝার রাতটা কাটত SDO সাহেবের* বাসায়। ভদ্রলোকের বাড়ি সিন্ধু। আঝার সঙ্গে তার কোনোই মিল ছিল না। না চরিত্রে, না বয়সে বা স্বভাবে কিন্তু মিল ছিল আত্মিক। 'সিন্ধু থেকে চিঠি লিখেছে ছোটো ভাই আপনি যদি আসতেন তবে পড়ে শুনাতাম'। 'বহুদিন চিঠি পত্র পাই না, মন বড় খারাপ, আপনি যদি আসেন তবে মনটা একটু হালকা হয়।' 'সুন্দরবন দেখতে যাব আমরা কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি বন্ধুও এসেছেন, আপনি যদি সঙ্গে আসেন।' এই জাতীয় Telephone আসত প্রায়ই।

বেচারা একা একা থাকে; রবীন্দ্র সংগীতের এক পঁজা রেকর্ড দিয়ে আসলেন আঝা। রবীন্দ্রসংগীতের অর্থ বুঝতে পারছেন না নিজেই গানগুলোর ভাবো অনুবাদ করে দিলেন। পিরোজপুরে ভালো দুধ পাওয়া যাচ্ছে না, বাসা থেকে একসের একসের দুধ পাঠাতে লাগলেন।

আগেই বলেছি আমদের সময় খুব ভালো কাটছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, খুব হইচই করে দিন কাটছিল! স্বাভাবিক যেমন কাটে তেমনি। সন্ধ্যার পর বেড়াতে যেতাম সবাই মিলে। বাসার ডানপাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা ছলারহাট পর্যন্ত গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে হাঁটতাম। টি.বি. হসপিটাল, টাউন কমিটি পেরিয়েও অনেক দূর যাওয়া হতো

* নাম মহিবুল্লাহ শাহ। বাড়ি সম্ভবত বেলুচিস্তান

দুপায়েই বিক্রি করি, দুবে বেখার রাত জমিয়ে প্রান,
 অসংখ্য নারিকেলের আশা বাতাস লেগে কাপছে,
 জমির কোমলতা। এক রাতের কথা খুব মনে পড়ে
 আটটার দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, কিন্তু ঝুঁপা পাতার
 তিতর দিশে বাসুচী গিলেছে। চাঁদ ঠাঁয়ে খুব
 নরম জোখনা। বাঁটেছি হঠাৎ স্তম্ভে পোনাম তিনু পাহাড়
 সান হচ্ছে। ঠাঁয়ে পাঁচ বিক্রিই হয়েছে মনোই

- সেদিন দুজনে দুজনেই বনে

খুলে উড়বে বাঁচী কুমরা -

চমৎকার লাগছিল। আশু বাসু দিচ্ছিলেন -
 দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনা। কিন্তু মোরুর খুব জাম
 লাগছিল তার কুড়া কুড়িতেই পানি শুভলাগা।
 এর পর যত রাত এ বাসু পাচা দিশে গিয়েছি
 তত বাঁচ মনে মনে গান গায়ের প্রতিভা করেছি।
 আর শুনা মাযনি।

মাখন মজারো কোম করে বহিবে আমতান
 দুবে বেখার আমাদের বাসুচী মনবে লাড়ুত। দুহানো
 আমলের নকশা কাটা শেরদ দালান- জেতেরী পিঠির
 পাঠেটের মিল আলা জ্বলছে। সামলের পুরুষে
 একটা মিলচে পাহিষ্কার প্রতিবিশু পড়েছে। নিজের
 বনা বনি করতান পিবেজাপুরের তামামেল শুলস
 জলে প্রতিবিশুত হয়েছে।

চাডক মাঝে হত নৌকা এমন। প্রকাঠ
 মরুকারী নৌকায় শুয়ে বসে বেড়ানো। গান
 বাজছে টেল বেকাট কিংগা পাঠেছে কোম
 কিশু। আমিকা কামের জল চঠিয়েছে। নৌকা
 চলছে নদীর গায়ে। নদীর জল আমনার মত মন

দুপাশেই বিস্তীর্ণ মাঠ, দূরে রেখার মতো অস্পষ্ট গ্রাম, অসংখ্য নারিকেলের শাখা বাতাস লেগে কাঁপছে, অপূর্ব লাগত। এক রাতের কথা খুব মনে পড়ে। আটটার দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, হিন্দুপাড়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গিয়েছে। চাঁদ উঠেছে; খুব নরম জোছনা। হাঁটছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম হিন্দুপাড়ায় গান হচ্ছে। উঠোনে পাটি বিছিয়ে বসেছে সবাই—

‘সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনা।’

চমৎকার লাগছিল। আমরা তাড়া দিচ্ছিলেম— ‘কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনা। কিন্তু শেষে খুব ভালো লাগছিল তার জোরাজুরিতেই সম্পূর্ণ গানটি শুনলাম। এরপর যত রাতে ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছি ততবার মনে গান শুনব প্রতীক্ষা করেছি। আর শোনা যায়নি।

যখন বেড়ানো শেষ করে ফিরে আসতাম দূর থেকেই আমাদের বাসাটা নজরে পড়ত। পুরানো আমলের নকশাকাটা হলুদ দালান ভেতরে টিউব লাইটের নীল আলো জ্বলছে। সামনের পুকুরে একটা নীলচে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব পড়েছে। নিজেরা বলাবলি করতাম পিরোজপুরের তাজমহল যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

মাঝে মাঝে হতো নৌকা ভ্রমণ। প্রকাণ্ড সরকারি নৌকায় শুয়ে বসে বেড়ানো। গান বাজছে টেপ রেকর্ডে কিংবা গাইছে শেফু, শিখু। মাঝিরা চায়ের জল চড়িয়েছে। নৌকা চলছে মস্তুর গতিতে। নদীর জল আয়নার মতো ঝক ঝক

ক'বধে, দু'রে ছবি'র মত সুন্দর সরুজ গ্রাম, সন্তু নামে শ্রীবে
 শ্রীবে, নদীর মানি গাওঁ মর্মান শ্রুদ ব'ন প্রায় ক'বধে,
 গাওঁের পাশা কোথের বেলা লেগে মোনার মত কুখাধা
 মনটা উদাম হ'লে ক'বধে। উঠা-

সন্ধ্যার আশ্রয় উনি হ'ত জায়ী সজায়।

প্রধান ব'চনা আমি ব'বধেই ব'নতেন আমায়।
 আনা এই মোনার প্রায়ই প্রাকৃতন। মেদিন থাকতেন
 মেদিন ব'নতেন শুধু তিনিই, আমাদের স্তার পাশা।
 ক'বধেই সন্ধ্যা ছিল তাঁর পু'বই প্রিয়। এ উনি সব
 প'বধেই ব'নতেন। তার ব'নার কামায়ে কোনদিন দেখি
 পু'বালো ধনে হ'লে না। একটা দু'টা এই ব'বধেই -

° আমি তখন একাকীতাম' দেবার দান
 শ্রীবে'র এক বেলা আমি। সন্ধ্যে আত'ন দু'খিনি।
 একদিন এক সন্ধ্যে প'বধেই কালো ম'বধেই
 পু'ব সুনিদ্রা হ'ল। ক'ই পা'ই কালো ম'বধেই?
 বু' ক'বধে ম'ই সমস্যার সমাধান হ'ল। একদিন
 বিকেলে ম'ই এম' দেখি ম'বধেই ম'ই,
 দু'খিনি ম'ই। বিকেল স'বধেই ম'ই। স'জা
 স'বধেই ম'ই। দু'খিনি ম'ই দেখা ম'ই। প'বে ম'বধেই
 ম'ই স'বধেই হ'ক সা'বধেই ক' কালো ম'বধেই
 দেখা ম'ই। কালো ম'বধেই এ'ত স'বধেই ক'বধেই
 ক'বধেই পা'ব P ম'বধেই ম'ই ম'ই ম'ই
 প'বধেই ম'বধেই হ'ত।

করছে, দূরে ছবির মতো সুন্দর সবুজ গ্রাম, সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে, নদীর পানি গাঢ় হলুদবর্ণ ধারণ করেছে, গাছের পাতা শেষের রোদ লেগে সোনার মতো জ্বলছে। মনটা উদাস হয়ে উঠত।

গল্পের আসরগুলো হতো ভারি মজার। প্রধান বক্তা আমি, তারপরই বলতেন আম্মা। আঝা এই আসরে প্রায়ই থাকতেন না। যেদিন থাকতেন সেদিন বলতেন শুধু তিনিই, আমাদের শোনার পালা। কয়েকটি গল্প ছিল তার খুবই প্রিয়। এ-গুলো সবসময়ই বলতেন। তার বলার কায়দায় কোনোদিন সেগুলো পুরোনো মনে হতো না। একটি গল্প এই ধরনের—

‘আমি তখন কলকাতায় কেশব দাস স্ট্রিটের এক মেসে থাকি। সঙ্গে আছেন দুদু মিয়া*। একদিন এক বইয়ে পড়লাম কালো মশারিতে খুব সুন্দ্রা হয়। কী পাই কালো মশারি? রং করে সেই সমস্যার সমাধান হলো। একদিন বিকেলে মেসে এসে দেখি মশারিও নেই, দুদু মিয়াও নেই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। দুদু মিয়ার দেখা নেই। পরে শুনলাম সে গিয়েছে হক সাহেবকে কালো নিশান দেখাতে। কালো নিশান এত তাড়াতাড়ি করে কোথায় পাবে। মশারিটাই নিয়ে গিয়ে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।’

* সম্পর্কে নানা।

আমার সপ্তমের ওষাণের মতো দুজন সন্তান বনাব
 পুত্রসাগ দোক। একজনকে প্রিয়তম বলাতেন অন্য
 জন কে দিয়ে জোড় করে বনানো হত। তাঁরা হল
 আমমা ওর ছোট ছায়ে বাছিন। বাছিনের সপ্ন
 ছিল দুটি; আশ্রা এই দুটিই বাবুসার স্তন্যদেয়
 এবং প্রতিবারই সমান আনন্দ পেতেন। ওষাণদের
 কাছে এক ছোঁয়ে বাচালো আমার আনন্দ দেখে
 আমাদের ভাল লাগে। বাছিনের সপ্নটি এই।

“আমার বসু আজাদের পুর বুদ্ধি। ক্রমে তার
 স্যার জিজ্ঞেস করেছেন, ‘আমাদ কাল
 আসনি কেন?’ আমা উত্তরে একটা মস-
 সপ্ন শুরু করল স্যার আশ্রি পরশু-
 বিকেলে আমা সঙ্গে চম্পেইমান গোমায়
 মেথানে আমাদের আশ্রা একটা দোকান
 দিয়েছে। এম স্যার এ কেলার দিকে
 অনেক সার্ব নে হল বাছিন। আমার আশ্রা
 সেই দোকান থেকে আমাকে একটা সার্ব
 সার্ব কিলে দিয়েছেন। বাছিন দেবে
 সেই সার্ব এম কেলার দিকে ও
 হল বাছিন। তারপর স্যার সার্বসের
 জেতবই মঠে কা কুয়া দেয়াল। মঠে
 কা কুয়া হল একটা কুয়া সার্ব সিতের
 মঠে সার্বকেল চানায়। এটা দেখে আমা
 আশ্রি একটা মঠে কা কুয়া বাসিনেমান

আব্বার গল্পের আসরে মাত্র দু-জন গল্প বলার সুযোগ পেত। একজন স্বেচ্ছায় বলতেন, অন্য জনকে নিয়ে জোর করে বলানো হতো। তারা হলো আম্মা আর ছোটো ভাই শাহীন। শাহীনের গল্প ছিল দুটো, আব্বা এই গল্পগুলো বারবার শুনতেন এবং প্রতিবারই সমান আনন্দ পেতেন। আমাদের কাছে একঘেঁয়ে লাগলেও আব্বার আনন্দ দেখে আমাদের ভালো লাগত। শাহীনের গল্পটি এই :

“আমার বন্ধু আজাদের খুব বুদ্ধি। ক্লাসে তাকে স্যার জিজ্ঞেস করেছেন, ‘আযাদ কাল আসনি কেন?’ আযাদ উত্তরে একটা মস্ত গল্প শুরু করল— ‘স্যার আমি পরশ বিকেলে আব্বার সঙ্গে গিয়েছিলুম মেলায় সেখানে শহীদের আব্বা একটা দোকান দিয়েছে। ঐযে স্যার ঐ কোণার দিকে হলুদ শার্ট সে হলো শহীদ। আমার আব্বা সেই দোকান থেকে আমাকে একটা মোটর গাড়ি কিনে দিয়েছেন। শাহীন দেখেছে সেই গাড়ি। ঐযে কোণার দিকে ও হলো শাহীন। তারপর স্যার সার্কাসের ভেতরই মউত কা কুয়া দেখলাম। মউত কা কুয়া হলো একটা কুয়া যার ভিতরে মোটর সাইকেল চালায়। ঐটা দেখে বাসায় আমি একটা মউত কা কুয়া বানিয়েছিলাম

কোন সার্বাধিক চমৎকারে আমার চোখের সাতটা চানিদে
দ্বিধাম হারি আমলে পাতি নাই।'

আজ্ঞাত পুর জ্ঞান সন্ধা করতে পারতেন। তা
ছাড়া চমৎকার অনুকরণ করতে পারতেন। তাঁর
সন্ধা অর্থাৎ অধিকারের স্মৃতিচারণ। নিজের কথা,
নিজের প্রাসের কল্পদের কথা, আমাদের দুটি কেরার
কথা, চমৎকার লাসে করে। তাঁর একটি চমৎকার
স্মৃতি কথা নিম্নলিখিত এইখানে যাতে তাঁর স্মৃতির
কিছটি দিকটা সুন্দর মোটেছে।

"নতুন দিনে হমেছে তখন। সারার রাত্তিতে
বেঙোতে এসেছি। আরেকদিন বোর আমার কোন গরু
সেই। কামটা কিছুই বিমিষ্ট। রাত তিনটার দিকে
বোর মানু ডেকে ডুলনের। আমায় এনেছে। বড়ো
আজ্ঞে জোর জাব্রা। এই প্রথম বাবুর মত
একটা প্রামোহন। এনেছে। তাকে গিবে কজুন
নজরুল এটা। সার হোজ উঠল। আমায় জীবন
প্রথম স্তনা প্রামোহনের পান। জাব তে কি চমৎকার
সান
...বোর এক সাতের বড়ো কথা হজাম
স্তনা স্তন
কপকথা নমু তে নমু...."

সত্যের রাত, সত্যে নিম্নলিখিত হমে সান সুরছে।
কি তে জ্ঞান পাগলো আমায়।"

সন্ধার জামরে আমার প্রতিকারী প্রামুৎ।
পত্নীর; হামির গল্প লাতে স্তনা। কপি পত্নীর
বিবিকার কাঁজটা আনলেই বড়ো মখন

কাল সারাদিন সেইখানে আমার মোটরগাড়ি চালিয়েছিলাম। তাই আসতে পারি নাই।’

আম্মাও খুব ভালো গল্প করতে পারতেন। তাছাড়া চমৎকার অনুকরণও করতে পারতেন। তাঁর গল্প অবশ্য অধিকাংশই স্মৃতিচারণ। নিজের কথা, নিজের গ্রামের বন্ধুদের কথা, আমাদের ছোটবেলার কথা, চমৎকার লাগে শুনে। তাঁর একটি চমৎকার স্মৃতি কথা লিখছি এইখানে, যাতে তাঁর স্মৃতির মিষ্টি দিকটা সুন্দর ফুটেছে।

“নতুন বিয়ে হয়েছে তখন। বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। অনেকদিন তোর আবার কোনো খবর নেই। মনটা কিছু বিক্ষিপ্ত। রাত তিনটার দিকে তোর নানু ডেকে তললেন, ‘জামাই এসেছে।’ তোর আবার তখন এই প্রথম বাবুর মতো একটা গ্রামোফোন কিনে এনেছে। তাকে ঘিরে ফজলু *সেজরুল** এরা। হঠাৎ গান বেজে উঠল। আমার জীবনে প্রথম শোনা গ্রামোফোনের গান। আর সে কি চমৎকার গান—

‘...কোনো এক গায়ের বধুর কথা তোমায়
শুনাই শোনো

রূপকথা নয় সে নয়...’

গভীর রাত, সবাই নিবন্ধ হয়ে গান শুনছে। কি যে ভাল লাগলো আমার।”

গল্পের আসরে আমার ভূমিকাটা প্রায়ই পড়ুয়ার। হাসির গল্প পড়ে শুনানো। পড়ানোর বিরক্তিকর কাজটা আনন্দেই করতাম যখন

* বড় মামা এবং মেজো মামা।

দেখাশুন এতে অন্যদের আত্মাও লাগবে না।

একদিকে চলে যে অসংখ্য আন্দোলন
 অন্যদিকে আমাদের গণতান্ত্রিক জীবন বাঁচা।
 হাঙ্গি সান আয়ু সপ্তম ঠাণ্ডা মুখো জীবন।
 এও অসংখ্য বাসায় একদিন জীবন আনা হল। ক্যাপিটাল;
 অসংখ্য বিজ্ঞানের দুর্ভাগ্যে কিছুতেই বিশ্বাস করা
 চলে না। তবু সফল হলে উদ্ভিদে দিতেও
 কিছু বাঁচা আছে। উদ্ভিদে হলেন ০.৫. মাহেবা।
 মন লোক জীবন আনবে তাকে বহিষ্কার থেকে
 খবর পাঠিয়ে জানায়ে হল। আত্মাও উদ্ভিদেই সবচেয়ে
 বহিষ্কার। এর পরিষ্কার করে, সোনাপাতাল দিয়ে,
 দুর্ভাগ্য জালানা বহন করে উদ্ভিদকে আনন করে কল্যাণ
 বাঁচি নিয়মে হল। আত্মাও উদ্ভিদেই হল। অসংখ্য
 করছি। উদ্ভিদকে জোড়ান করে কল্যাণে লাগলেন।
 আর মস্তি মস্তি জীবন মন মন পর্যন্ত। কথা
 বাঁচাও হল। প্রথম জীবন মন 'ভেদিত্তিকোত্তমিত্তম'
 এর সাহায্যে জীবন থেকে এমন জীবন কথা
 বলা শব্দ মনে মনে বহু বিভিন্ন দিক থেকে
 কথা ভেদে আসছে। কিন্তু তবু বহু মন থেকে মন
 কারণ প্রায় সব সময়ই উদ্ভিদকে জোড়ান আত্মা
 আর জীবন কথা বাঁচা একই মন জ্ঞান মাড়িন।
 তা ছাড়া এই জীবনই ০.৫ মাহেবের বাসায় মন
 মনে আত্মাও মন চলেই কথা নিয়মে মনই দুর্ভাগ্য
 মনেছিল এবং ০.৫ মাহেবের বহু মন মন মন মন
 মন মন একই মন মন ও উদ্ভিদেই। বহু উদ্ভিদ
 মনে পরীক্ষার ECG করবে ০.৫
 মাহেব মন মন মন মন মন মন মন মন

দেখতাম এতে অন্যদের খারাপ লাগছে না।

একদিকে চলছে অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে আমাদের গতানুগতিক জীবনধারা। হাসি গান আর গল্পে ঠাসা সুখী জীবন।

এর মধ্যেই বাসায় একদিন জিন আনা হলো। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। তবু সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দিতেও কিছু বাধা আছে। উদ্যোক্তা হলেন C.G. সাহেব। যে লোক জিন আনবে তাকে বরিশাল থেকে খবর পাঠিয়ে আনানো হলো। আন্নার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। ঘর পরিষ্কার করে, গোলাপজলে ধুয়ে, দরজা-জানালা বন্ধ করে ভদ্রলোক আসন করে বসলেন বাতি নিভানো হলো। আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে অপেক্ষা করছি। ভদ্রলোক কোরান আবৃত্তি করতে লাগলেন। আর সত্যি সত্যি জ্বিন এলো শেষ পর্যন্ত। কথা বার্তা হলো। প্রথম ভাবলাম হয়ত 'ভেন্ডিলোকুইজম'— যার সাহায্যে এক জায়গা থেকে এমনভাবে কথা বলা যায়, যাতে মনে হয় কিছুদিন দিক থেকে কথা ভেসে আসছে। কিন্তু তবু রহস্য থেকেই যন্ত্রণা কারণ প্রায় সবসময়ই ভদ্রলোকের কোরান আবৃত্তি আর জিনের কথা বার্তা একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল। তাছাড়া এই জিনই O.C সাহেবের বাসায় রাগ হয়ে আড়াইমণি চালের বস্তা নিমিষের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং O.C সাহেবকে বলেছিল যে তার হৃৎপিণ্ড একটু লম্বাটে ও ডিফেকটিভ।* বড়ো ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা Euctrocardiograph করে O.C সাহেব সত্যি তার হৃৎপিণ্ডের এই দোষ জানতে পেরেছিলেন।

* সঠিক তথ্য সেরকম প্রমাণ নেই।

জীবনের সঙ্গে আমাদের নিম্ন-লিখিত কথা হলো হে

আব্বা: জামানাতু ওয়াস্বুলা

জীম: ওয়াস্বুলা ওয়াস্বুলা

আব্বা: জনাব দেওয়ার বর্তমান অবস্থা দেখে আমরা সত্যই
খুব বিচলিত। কোম চার্মনু কি হবে বলবেন দয়া
করে?

জীম: জামানাত অতি সার্বিক জীব, তদ্বিশেষ্য বলাব
সংক্রান্ত জামানাত হলেই। অতি সামান্য সাহায্যতা
আছে তাতে বুদ্ধি সঞ্চার হবে আপনাদেরই। সব
পক্ষেই বড় বিপদ, দেশের সব জন্ম সহায়।
এই বিপদ। হাত দুইতে জামানাত করি।

(চলবে)

আব্বা: আপনাকে হেঁচকি থাকার বলবেন কি

জীম: হেঁচকি কান্না নগর

আব্বা: মানুষ হলে চাঁদে গিয়েছে তা বিশ্বাস করেন

জীম: (কিছুক্ষণ চুপচাপ) গিয়েছে নাকি?

আব্বা: জীবনের সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জানতে
ইচ্ছা করে আপনি জানাবেন কি?

জীম: এই সম্বন্ধে পাবে জামানাত কবব। জামানাত
নিজনে আমার কথা চিন্তা করবেন। জামানাত
আমি জামানাত।

জিনের সঙ্গে আমাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো :

আব্বা : আসসালামু আলায়কুম

জিন : অলায়কুম আসসালাম

আব্বা : জনাব, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমরা সবাই খুব বিচলিত। শেষ পর্যন্ত কী হবে বলবেন দয়া করে?

জিন : আমরা তো অতি সাধারণ জীব, ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতি সামান্য যা ক্ষমতা আছে তাতে বুঝি জয় হবে আপনাদেরই। তবে সামনে বড়ো বিপদ, দেশের এবং অন্যান্য সবার। মহাবিপদ। হাত তুলে দোয়া করি।

(দোয়া চলল)

আমি : আপনারা কোথায় থাকেন বলবেন কি?

জিন : কোহুকাফ নগর।

আমি : মানুষ যে চাঁদে গিয়েছে তা বিশ্বাস করেন?

জিন : কিছুক্ষণ চুপচাপ। গিয়েছে নাকি?

আব্বা : জিনদের সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি জানাবেন কি?

জিন : এই সম্বন্ধে পরে আলাপ করব। আপনি নির্জনে আমার কথা চিন্তা করবেন। আমি আসব।

সেইসময় রাজনৈতিক দাট আবার পরিবর্তিত হলে।
সমস্ত সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে জেল হত্যার
কোষে কোষে মুক্তিযুদ্ধে হাত। দাঁড়ে এন ইন্সপেক্টর।
সকাল বিকাল কোষে সাংসদের সঙ্গে সুদীর্ঘ
মিটিং। আমার আত্মা সেসময়ে পেল সহ্য।
'ইন্সপেক্টর কোষে মুক্তির আন্দোলনের অগ্রসঙ্গতি'
খবরের কাগজে দেখতে পেতাম। দুজনের হামি
হামি মুখের জ্বলন্ত ছায়া এর বিভিন্ন কাগজে।

আমি তিনের তিনের এম্বি হলে স্টেটসম্যান
সামান্য দিন কাটাতে অসুবিধে। একইসঙ্গে তাঁর
বুকে পাঠ্যের অর্থাৎ অর্থাৎ। কাজেই হাত-
খানস এর দল আলতে পারেন। তার জন্য কর্মসূচি
এমন জটিল পরিষ্কারি এম্বি হলে।

এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আমায় প্রথম
ঔপন্যাস 'সিদ্ধান্ত লোকের পক্ষ নিয়ে লেখ
করলাম। আমায় হয়ে আমায় চেলে 'নিম্নে
পড়তে। আমি দুই সপ্তাহে অপেক্ষা করছি
আমায় অন্তর্ভুক্ত করতে। এম্বি ঔপন্যাসের কাহীনী
চূড়ান্তে বনছি -

পারিবারিক শর্তাবলি পরিবর্তনের কাহীনী।
প্রেম প্রবণ আমায় কেন্দ্রিক বহু দলনে। হিন্দুর কন্যা
হলেও অনেকদিন কিছু টাকা, কাপ জার মনোমত
পাত্রে অর্থাৎ 'বিশ্বে' স্থানি। আমায় প্রকাশ বাসক।
দাঁড়ে দুই বোন চরম প্রকাশিত, হামি মুক্তি। বাবা
নিবন্ধ মানুষ, প্রদানে তার অস্বাভাবিক প্রেম আমায়
তার মনোমত হাতে যা বহু। বহুমানের অপেক্ষা

দেশের রাজনৈতিক পট আবার পরিবর্তিত হলো। সমস্ত ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত দেশবরেণ্য নেতা শেখ মুজিবের হাতে। দৌড়ে এল ইয়াহিয়া। সকাল-বিকাল শেখ সাহেবের সঙ্গে সুদীর্ঘ মিটিং। আশার আলো দেখতে পেল সবাই। 'ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব আলোচনার অগ্রগতি' খবরের কাগজে হেডিং বেরুল। দু-জনের হাসিহাসি মুখের ছবিও ছাপা হলো বিভিন্ন কাগজে।

আব্বা ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। সারাটা দিন কাটাতে খবর শুনে। অনিশ্চয়তা তার বুকে পাথরের মতো চেপে বসছে। কাজ ছাড়া যে-মানুষ একদণ্ড থাকতে পারে না তার জন্যে কর্মশূন্য এমন জটিল পরিস্থিতি অস্বস্তিকর বটে।

এমনি অস্বাভাবিক পরিবেশেই আমার প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত লোকে'র শেষপর্ব লিখে শেষ করলাম। আমার পড়া হলে আব্বা চেয়ে নিলেন পড়তে। আমি দুঃখের বক্ষে অপেক্ষা করছি আব্বার মন্তব্য শুনতে। এবার উপন্যাসের কাহিনি চুম্বকটা বলছি—

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি। স্নেহপ্রবণ আত্মকেন্দ্রিক বড়ো মেয়ে। বিয়ের বয়স হয়েছে অনেকদিন কিন্তু টাকা, রূপ আর মনমতো পাত্রের অভাবে বিয়ে হয়নি। আবেগপ্রবণ নায়ক। ছোট দুই বোন চঞ্চল প্রজাপতি, হাসি খুশি। বাবা নিরীহ মানুষ, হৃদয়ে তার অফুরন্ত স্নেহ অথচ তার খোঁজ রাখে না কেউ। বড়োলোকের খেয়ালি

মেমো কিতোরি কে ডান নাগাল নামু কেবু। জখ নাগাল
 একতরুনা নামু কেবু। কিতোরি সহজ জামরুনা জুতাকে
 ভালবাসা ভেব খুন করুন মে। কোম জমে তদনা
 সোন বড় মেমু তার নিসক দিন কাটোমে। জেলী
 বিয়ে করেছে সহজ সাহাষণ একটা মেমুকে। বাবাও
 আজ সজোগিন। অহাচ পুখিরা তেলনি চলছে
 চাঁদের নটোম হজোনা তেলনি ছবিমে পহমে
 পুখিরা। অহোর সাহাষণ লুমেছে ইখি। উপন্যাসে
 পাঠ পাঠিকা আজ নির্দিষ্ট স্মৃতি চবলে গ্রাস।
 সমস্ত দেশেও আজ মেন কেটে কিছু পামনি।

কখন বস প্রাণ উপন্যাস। মেমুনে
 কনুর চরিত্রটা খুব দরদ দিখি জিমেছি। কনু
 ওহোর নামকের দোটে মোহা বাবুর উপন্যাস নিয়ে
 এটা লেখা করেছি বলে বলা বাস্তবানুগও হটে।
 নিজের সাহাষণ খুব সাহি হমেছে। আগুহ নিমে আলো
 করছি আনু কি বলা দেখনাম তিনি খুব উপমা
 নিমেই পড়েন। দুপুরে উপন্যাস হাতে এলিমে চলে
 গেলেন। পাড়া কোম হন বলেন না কিছই, শুধু
 কোমুকে জিজ্ঞাস করলেন "তার দানাতপনের কইটা
 পাঠিছিম?"

বাত্তে শুনে আসাকে ডাকলেন। বললেন
 "গোর উপন্যাস খুব মনি দিমেই পাঠেছি। দুই
 এক জামগানু একটু অমঃ মন হমেছে।" বলে
 দু একটা টেকনিজের ছবি দেখিয়ে দিলেন।

মেয়ে কিটকিকে ভালো লাগল নাযকের। ভালো লাগাটা একতরফা নাযকেরই। কিটকির সহজ ভদ্রতাকে ভালোবাসা ভেবে ভুল করল সে। শেষ অঙ্কে দেখা গেল বড়ো মেয়ে তার নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছে। ছেলেটি বিয়ে করেছে সহজ সাধারণ একটি মেয়েকে। বাবাও আজ সঙ্গীহীন। অথচ পৃথিবী তেমনি চলছে, চাঁদের নরোম জোছনা তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। অবোর ধারায় নেমেছে বৃষ্টি। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা আজ নির্লিপ্ত স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। সমস্ত পেয়েও আজ যেন কেউ কিছু পায়নি।

করণ রসপ্রধান উপন্যাস। যেখানে রুনুর চরিত্রটা খুব দরদ দিয়েই লিখেছি। রনু নাযকের ছোটোবোন বাস্তব উপাদান নিয়ে এটা তৈরি করেছি বলে বেশ বাস্তবানুগও বটে। নিজের ধারণা খুব ভালোই হয়েছে। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছি আকা কী বলেন। দেখলাম তিনি খুব উৎসাহ নিয়েই পড়ছেন। দুপুরে উপন্যাস হাতে অফিসে চলে গেলেন। পড়া শেষ হলে বললেন না কিছই, শুধু শেফুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর দাদা ভাইয়ের বইটা পড়েছিস?'

রাতে শুয়ে আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'তোর উপন্যাস খুব মন দিয়েই পড়েছি। দুই এক জায়গায় একটু অসংলগ্ন হয়েছে...' বলে দু-একটা টেকনিকেল ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন,

তাপস বসলেন, "বেলা হইছেবে, আমার খুব ভাল
 লগেছে।" ~~কিন্তু~~ কুরুর উর্দির আশাটা পড়তে পড়তে
 চোখে পানি এসে যায়। আমারও একটা উপন্যাস
 লেখার কথা দিনের মধ্যে। তবে সেটার স্বার্থ থাকেনা
 আর সমস্যাই বা কী!

বাত্তে শোনে গোয়ে: আশ্রায় কখনো ভাবছিলনা
 সম্মান নিজের ~~কি~~ পরিচয়টার তাঁর একটা বই ছাপার
 এবং সেটা ছাপায় প্রচুদে সব দিক থেকেই যেন অন্যায়।
 অবশ্য এই তখনই সিদ্ধির একটা কারণ ছিল। তখনই তার
 সামান্য সমস্যা থেকেই একটা বই ছাপিয়েছিলেন। সেটা
 সেই কারণেই ছাপায় প্রচুদে আসলে কুরুর নিজস্ব মানেই হলে
 তাঁর মনোবলসহ কারণ হলেই। বচন ভাল হলে শব্দ
 তা কাকে হুন্ডি আচরণ পাঠিয়ে:

বখন বেড়ালে আমলের এই সময়টাকে,
 তেঁতে আর আমের চরমে উঠল। সেটার মোহামার
 গুণ মাঝে এসে ছাটিল। তাদের আমের উপলক্ষে
 পারিবারিক দেয়ার পত্রিকা 'পুনিলিত সাংস্কৃত' এর বিশেষ
 সংখ্যা বন্ধু করুন এর সম্পাদিকা গামতাজ আহমেদজি।
 সেও বন্ধুদির কুর্জিলায় থেকে এসেছে। কাকলে তার উসমা
 প্রায় বন্ধু ছাড়া। আমাদের খাঁসি আনলে তিনটি
 ডেজান বিকাল মাসা কোর এক সেজাত কারণে
 বাগ করে পুনরা চলে সেলের তাঁর তাইনেও
 কাছ। মোদা বসলেন, 'সবুর কাকে দেখলে দুদিন
 পর বন্ধু মোখান থেকে কল করে আবার এখানে
 এসে পড়বে।

তারপর বললেন, ‘বেশ হইছেরে, আমার খুব ভালো লেগেছে, রুনুর ডাইরির অংশটা পড়তে পড়তে চোখে পানি এসে যায়। আমারও একটা উপন্যাস লেখার বহুদিনের সখ। তবে আমার ধৈর্য থাকে না আর সময়ই-বা কই!’

রাতে শুয়ে শুয়ে আবার কথাই ভাবছিলাম। সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনায় তার একটা বই ছাপাব এবং সেটি ছাপায়, প্রচ্ছদে সব দিক থেকেই হবে অনবদ্য। অবশ্য এই ভাবনার পিছনে একটু কারণও ছিল। আঝা তার সামান্য সঞ্চয় থেকেই একটি বই ছাপিয়েছিলেন। সেটি সেই কারণেই ছাপায়, প্রচ্ছদে, কাগজে খুব নিকৃষ্ট মানের হয়ে তাঁর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। রচনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও তা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

রহুল মামা বেড়াতে আসলেন এই সময়টাতে। হইচই আর আমোদ চরমে উঠল। সোনায় সোহাগার মতো নানাও এসে হাজির। তাদের আগমন উপলক্ষে প্যারিস পারিবারিক দেয়াল পত্রিকা ‘সুনিলিত সাগরিত’* এর বিশেষ সংখ্যা বের করল এর সম্পাদিকা মমতাজ আহমেদ শিখু। সেও ঠিকদিন কুমিল্লায় থেকে এসেছে। কাজেই তার উৎসাহ প্রায় বন্ধা ছাড়া। আমাদের খাঁটি আনন্দে কিছুটা ভেজাল মিশল। মামা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে রাগ করে খুলনা চলে গেলেন তার ভাইয়ের কাছে। আঝা বললেন, ‘সবুর করো দেখবে দুদিন পর রহুল সেখান থেকে রাগ করে আবার এখানে এসে পড়বে।’

* পারিবারিক পত্রিকা, কারো জন্ম বা বিয়ে উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। নামটি হুমায়ূন আহমেদের দেওয়া।

নানাও চলে গেছেন। পুত্ররা পুত্রী মজিই গেছেন।
 এদিকে কাকেরা প্রায় নিটে গেছে। VOA থেকে
 বলা দল শোনা সুজিব আর প্রুয়াহিন্দার তেজর
 একটা অপোম রয়েছে। ঝমতা হত্যাক্রমে রাজী
 হৈয়েছেন প্রুয়াহিন্দা। আমার সন্ন আবাদ হইলে তার
 জয়ার পবিত্রতা দিতে হবে তেবে। মেয়ু, জিয়া
 ইকরালও সুখ কালো করে ঘুরতে লাগলো সব
 টিক হইলে সাথে জয়ার হোস্টেলর বিয়ান্দ
 এক হৈয়ে জীবর।

২২ পর সময়
 AMARBOL.COM

নানাও চলে গেলেন খুলনা; খুশি মনেই গেলেন। এদিকে ঝামেলা প্রায় মিটে গেছে। VOA থেকে বলা হলো শেখ মুজিব আর ইয়াহিয়ার ভেতর একটা আপোষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয়েছেন ইয়াহিয়া। আমার মন খারাপ হয়ে গেল আবার পরীক্ষা দিতে হবে ভেবে। শেফু, শিখু, ইকবালও মুখ কালো করে ঘুরতে লাগল সব ঠিক হয়ে যাবে— আবার হোস্টেলের নিরানন্দ একঘেঁয়ে জীবন।

(২য় পর্ব সমাপ্ত)

AMARBOI.COM

কর উঠল সত্যি মতি। অকস্মৎ তালতবল বিস্তারত কৈরী
বসতে সুমিষ্ট পরিবেশনারা মনন করাত এগিয়ে এমন
লে জে. চিন্তা।

সত্যি ব্রাহ্ম সেই সেই স্তলে খুলে জালনা।
অধিসের টেলিফোন অসবক বের্তেই চলেছে। রাইবে
বল লোকের পদচারণা। গায়কের ঘোষণা—

"অসামান্য গুণাবলি। সত্যি আমুন ধানার
পাতলে রাখি জ্ঞান। গুণাবলি গুণাবলি"

আজ্ঞা আগেই উঠিয়ে। জাম্বাও উঠিয়ে। কোরু কৈরান
কিছুই গুলুও ভেলেছে। আমি আজ্ঞা আমু ইকরান
দৌরু চলনাম ধানার। মনে আছে অধিসের পাণ্ডা
পুলার বকসি। রাত তখন দুই। ধানার পাতলে
অনেকেই জেত হয়েছেন, মনে আছে মনে আছে "কি জানি
কি মনে।" কোরু জাম্বাও ধানার ওপর মনে
আলাপ করে আমু সেনের wireless operator এর
ধরে। মেঘের মনে মনে বেরু হলে তখন তাকে
দেখে মনে রাখি একটি জাম্বা আমু হেত হয়েছেন
কিন্তু সত্যি মনে মনে wireless এ আমু এনেছে
সেনিটারীরা হাজারকো দুনিয়া হেত কোমার্টের আচরণ
করেছে। পুনরায় জাম্বা দুনিয়া লাইন খিদের
আছে। দুনিয়ার দুনিয়া জাম্বা জাম্বা dead. চিন্তাও
দুনিয়া জাম্বা চলেছে। কিন্তু কোরু জাম্বা হেত হেত
বুঝে পারছেন।

ঝড় উঠল সত্যি সত্যি। অবরুদ্ধ জলতরঙ্গে বিক্ষোভ তৈরি করতে সৃষ্টি পরিকল্পনা সফল করতে এগিয়ে এলেন লে. জে. টিক্কা।

গভীর রাতে হইচই শুনে ঘুম ভাঙল। অফিসের টেলিফোন অনবরত বেজেই চলেছে। বাইরে বহু লোকের পদচারণা। মাইকের ঘোষণা—

‘মহাবিপদ, মহাবিপদ, সবাই আসুন থানার সামনে হাজির হোন। মহাবিপদ মহাবিপদ’।

আব্বা আগেই উঠেছেন। আম্মাও উঠেছেন। শেফু, ইকবাল, শিখুর ঘুমও ভেঙেছে। আমি আব্বা আর ইকবাল দৌড়ে চললাম থানায়। সঙ্গে আছে অফিসের পাংখাপুলার রশীদ,* রাত তখন দুইটা। থানার সামনে অনেকেই জড়ো হয়েছে। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত ‘কি জানি কি হলো।’ বেশ শীত করছিল। পুলিশের o.c র সঙ্গে আলাপ করে আব্বা গেলেন wireless operator-এর ঘরে। সেখান থেকে যখন বের হলেন তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা মরা মানুষ বের হয়েছে ক্রান্ত গলায় বলছেন, wireless-এ খবর এসেছে মিলিটারিরা রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। খুলনায় তারা পুলিশ লাইন ঘিরে আছে। কুমিল্লার পুলিশ ওয়ারলেস dead, চিটাগাং-এ তুমুল যুদ্ধ চলছে। কিন্তু কেন এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না।

* পরবর্তীকালে পরিবারকে অনেক সাহায্য করেছে; একান্তরের পরে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চারিদিকে আমার জঞ্জাল। কেউ বনোতে জেগারের
হাফিজ হুসাইনকে হেজরাত করছে। কেউ বনোতে
সৈয়দের চারটে সন্তান লেগেছে। কেউ বনোতে
সোখা মুজিবকে সন্নি করে জেগে রেখেছে তাই
কাজেরা জাবার অরকে বনো আমেরিকার স্থান
দুর্গ লেগেছে।

সেই রাতে খেতে কষ্ট করত

সেই রাতে আমার খেতে পারত না। খেতে পারত না। খেতে
হাট দিলে না আসতে পারে। সেটা খুঁটো হাট
ব্যবহারে দিলে। কলিকাতা জেগে সন্তান উড়ে গেল।
কোনো জেগে জাবার জেগে সন্তান উড়ে গেল।
সেই রাতে কেউ কিছু নেই। একটা মেগার
বেলে চলছে। জেগে লেগে জেগে লেগে
জেগে জেগে করত। জেগে জেগে জেগে
অনুষ্ঠান চলছে। এটা জেগে জেগে জেগে
জেগে জেগে জেগে।

পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর নির্দেশাবলী
প্রচারিত হয়। ইসলামী শাসন দিবসে এগারোটার

"..... সোখা মুজিবকে বিনা বিচারে
আফিম দেওয়া দেওয়া। জেগে জেগে
শত্রু। জেগে জেগে জেগে জেগে
কবর। জেগে জেগে জেগে জেগে
মেগা বাহিনী জেগে জেগে জেগে
জেগে জেগে জেগে জেগে জেগে
এসেছে....."

চারিদিকে নানা জল্পনা। কেউ বলছে জেনারেল হামিদ ইয়াহিয়াকে গ্রেফতার করেছে। কেউ বলছে সৈন্যদের মধ্যে গণ্ডগোল লেগেছে। কেউ বলছে শেখ মুজিবকে গুলি করে মেরে ফেলেছে তাই এ-ঝামেলা। আবার অনেকে বলছে আমেরিকার গ্রিন ট্রুপ নেমেছে।

সেই রাতেই খেয়া বন্ধ করতে লোক ছুটল যাতে খেয়া পার হয়ে মিলিটারি বাগেরহাট দিয়ে না আসতে পারে। লোক ছুটল রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে। রশীদও তাদের দলে ভীড়ে পড়ল। কোলাহল আতঙ্ক আর হতাশার মধ্যে ভোর হলো। রেডিও ধরল সবাই। কই কিছু নেই, একটানা সেতার বেজে চলছে। আতঙ্কিত লোকজন আকাশবাণী শুনতে চেষ্টা করল। সেখানে রীতিমত প্রভাতী অনুষ্ঠান চলছে। এত সব যে হয়ে যাচ্ছে তার কেউ খবর নেই।

সকাল দশটায় সামরিক নির্দেশাবলি প্রচারিত হলো। ইয়াহিয়া ভাষণ দিলেন এগারোটায়—

‘... শেখ মুজিবকে বিনা বিচারে
আমি ছেড়ে দেবো। আওয়ামী লীগ দেশের
শত্রু। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা
করলাম। এবং আমার দেশ প্রেমিক
সেনাবাহিনী তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ন
রেখে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এগিয়ে
এসেছে...’

৩৪

চারিদিক থলথল করছে। সোতর বুকের ঠাঁপের ঢেপে
বসেছে। এই বুকি মেনিটোরী এসে পড়ল। জাভা
ইন্ডুস্ট্রি। S.P. বকিফান নিচুপ। শাকিস্তান বেতিও
থেকে তখন জনবহুল নাত এ বসুন অব শাসন
প্রচাফিত হচ্ছে।

দুপুরে আধুপের রত বসে বসেছি ট্রেনজিনটির
শিঙে। কি করলো ভেবে পাচ্ছি না। কোনকায় শেইন-
বীরে বেখেছি। হটাৎ সেখান থেকে সীতিকা জেতুটার
প্রচার বস্তা বেখে গুটায় বনা থল পূর্ব বাকসোয়,
সুইয়ুজা উকু হযুছে। পূর্ব ঢাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ব
বাংলা রেজিমেন্ট, পূর্ব ঢাকিস্তান পুলিশ, পূর্ব
ঢাকিস্তান আনসারস, পূর্ব ঢাকিস্তান সুরায়াদন
দুইয়ু প্রচিবেরি সংস্কারে উল্লেছে। তাহুপার
বাজান থল মেই হিওর সান "আমার মোরার
এওরা আছি হযু" "ভানবানি"

খিকেরে ব্রাজানবারিয়ার পুনিফা আওকন
থেকে বনা থল EOR এর জোয়ানরা এখালে
প্রচুর মেনিটোরী বেবেছে কী কবেছে ওবেও অনেক।
জাভা এগিয়ে চলছে কুমিল্লার দিকে। জাভা থের
পাতলা সোন দুইয়ু নটাই চলছে কুমিল্লার, চিটাগাং।
আচ্ছেরে রত কাটলো আবেও একটি দিন। ২০ জনিক
হালে বেরিওর নব দুইয়ু যদি কোন নিদেখী
শেইন ফিছু বলে হটাৎ সুরে সোনান সুইয়ু
বাংলা বেভার বেকু। শাহারের সমসু বুক ঠাঁপের
মুটেতে লাগলো। রাইরে তখন দুইয়ু ঠাঁপের, দুইয়ু

চারিদিক থমথম করছে। আতঙ্ক বুকের ওপর চেপে বসেছে। এই বুঝি মিলিটারি এসে পড়ল। আব্বা হতবুদ্ধি, S.P. বরিশাল নিশ্চুপ। পাকিস্তান রেডিও থেকে তখন অনবরত নাত-এ রসুল আর হামদ প্রচারিত হচ্ছে।

দুপুরে আচ্ছন্নের মতো বসে রয়েছি ট্রানজিসটার হাতে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। কলকাতা স্টেশন ধরে রেখেছি। হঠাৎ সেখান থেকে গীতিকা অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রেখে হঠাৎ বলা হলো পূর্ব বাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ব বাংলা রেজিমেন্ট, পূর্ব-পাকিস্তান পুলিশ, পূর্ব-পাকিস্তান আনসারস্, পূর্ব-পাকিস্তান মুজাহিদস দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু তুলেছে। তারপর বাজান হলো সেই বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়ীর পুলিশ ওয়ারলেস থেকে বলা হলো EPR-এর জোয়ানরা ঠিকানা প্রচুর মিলিটারি মেরেছে বন্দি করেছে আরো অনেক। তারা এগিয়ে চলেছে কুমিল্লার দিকে। আরো খবর পাওয়া গেল তুমুল লড়াই চলছে কুমিল্লায়, চিটাগাং-এ। আচ্ছন্নের মতো কাটল আরো একটি দিন। ২৮ তারিখ রাতে রেডিওর নব ঘুরাচ্ছি যদি কোন বিদেশি স্টেশন কিছু বলে হঠাৎ শুনতে পেলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় ফুটতে লাগল। বাইরে তখন তুমুল উত্তেজনা, তুমুল

৩৫
৩৪

বোম্বাই থেকে "স্বাধীন বাংলা বেতার"। স্বাধীন বাংলা
বেতার। অল্প সময়ের অনুষ্ঠান অল্প আয়তন
দিয়ে চালা।

"..... ওহা জানেনা আমরা কি চাই। জানেনা
EOR কি জিনিষ? জানেনা ওদের টুপি কেঁপে

যাবে। তুমি খুঁজ চলেছ। তুমি আমাদের সুবিধিত

এই দোয় অনুষ্ঠানটা বাঙালীদের চরম আর চমক
হাসান। কি জানেনের মতগাঠন না এনে দিন।

আমরা অর্ডারনি না জিমেও কেঁদেছে মঙ্গল আনন্দে।
বেড়িও - Ambea টো কোথায় তাই নিম্নে

অপরা কল্পনা। ছোয়কের বাহী কোথায় তাই নিম্নে
বাকি প্রবর্তিত কেউ বলছে যে আলী কেউ বলছে

মিলেট। সিদ্ধি বের হলে "স্বাধীন বাংলার
তুমি" তুমি বাংলায়

আমরা ~~এ~~ এর অদূত সব অরু পাচ্ছি।

কারা তৈরী করেছিলে সে সব কে জানে তবে তা
থেকে পরিষ্কৃতি হলে একটা জিনিষ তা হল বাঙালী

ক্রটিতা বোধ। অরু সুলি জানে না জিমে। আমি
হাসি মুখে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাবটা এতে

বরম হে একটা অরু জানি তবে মরে গেলেও
কনবো না। জানবা জানতে চাই 'কি অরু না জিমে'

ডাই 'তখনই' হত পা হাতে না জিমে ভয়েদের
অরু বলা শুরু হে। দু একটা অরু এই ইংরেজ

হইচই 'স্বাধীন বাংলা বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতার।' অল্প সময়ের অনুষ্ঠান অথচ আগুন দিয়ে ঠাসা।

'... ওরা জানে না আমরা কি চিজ। জানে না EPR কি জিনিস? আমরা ওদের টুটি টিপে ধরেছি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয় আমাদের সুনির্দিষ্ট। এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটা বাঙালিদের চরম আর ভয়াবহ হতাশায় কি আনন্দের সওগাতই না এনে দিলো। আবার অর্ডারলি নাজিমত কেঁদেই ফেলল আনন্দে। রেডিও centre-টা কোথায় তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। ঘোষকের বাড়ি কোথায় তাই নিয়ে বাজি ধরাধরি। কেউ বলছে নোয়াখালি কেউ বলছে সিলেট। মিছিল বের হয়েছে 'স্বাধীন বাংলার জয়' 'জয় বাংলার জয়'।

খুলনা শহরের অদ্ভুত সব খবর পাচ্ছি। কারা তৈরি করেছে সেসব কে জানে তবে তা থেকে পরিষ্কৃতি হচ্ছে একটা জিনিস তা হলো বাঙালি জাতীয়তাবোধ। খবরগুলো আনে নাজিম। হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবটা এই রকম যে একটা খবর জানি তবে মরে গেলেও বলব না। আমরা জানতে চাই 'কী খবর নাজিম ভাই' তখনই হাত পা নেড়ে নাজিম ভাইয়ের খবর বলা শুরু হয়। দু একটা খবর এই ধরনের :

২। খুলনা অফিসের সদর বাস্তব কে যেন এখ বস্তু
সেইসঙ্গে ডাল ঢেলে ফেললে দিচ্ছে। মন সুকম
মেলিটারী এখন পাও হতে যাচ্ছে তখনই পা
পিছল আসবে দম।

২। ট্রেঞ্চ বনে স্তম্ভাঙ্গল চলছে। একদিকে পশিমা
মেলিটারী অন্যদিকে বাস্তবী ট্রে.পি.আর।
কামার ব্রিসেডের মোকুকা তাকে তাকে ছিল
হোম পশিমা দিমে দিমেই মেলিটারীর
ট্রেঞ্চ পারি হটি করে। মেলিটারীগুলি
হাঁস হাঁস করে মরছে।

৩। একদম মেলিটারী মাফিল বাস্তব বেলে।
পাশে নম্বর পতন এক মাফিলের চাকর
উলার। এটা কি বো বাস্তব কাকে বোমা মরছে?
পারন মেখানে এখানে। স্নাকে স্নাকে
ভিন্নরুপ ঠেঙে এখানে মন সুকম মিল মেলিটারী
খাতন এখানে দুজন আসবে মেলিটারী।

চিক এই সময় আন্তর্জাতিক লিগ নেতার অধিবেশন
একটা বড় সুন হল। গিরোজপুর ট্রেজারী থেকে
আজুই ৩৩ রাইফেলের গুলি হেমে গেল। মার
পুদুর প্রমাণিত কুমার আন্তর্জাতিক লিগ নেতার
দেখে গেলেন। পুলিশের গান সম্বন্ধে আত্মপ
হেমে গেল জরসারীকরণে। আন্তর্জাতিক লিগ নেতার
গানে মরুকুমা পুলিশ প্রবীণ হিসেবে মরুকুমা
হেমে গেল আজুই

১। খুলনা শহরের সদর রাস্তায় কে যেন একবস্তা অড়হড়ের ডাল ঢেলে ফেলে দিয়েছে। ফলস্বরূপ মিলিটারি যখন পার হতে যাচ্ছে। তখনই পা পিছলে আলুর দম।

২। ট্রেনে বসে গুলাগুলি চলছে। একদিকে পশ্চিমা মিলিটারি অন্যদিকে বাঙালি ই.পি.আর। ফায়ার ব্রিগেডের লোকরা তক্কে তক্কে ছিল হোস পাইপ দিয়ে দিয়েছে মিলিটারির ট্রেনে পানি ভরতি করে। মিলিটারিগুলি হাঁসফাঁস করে মরছে।

৩। একদল মিলিটারি যাচ্ছিল রাস্তা বেয়ে। পথে নজর পড়ল এক ভিমরুলের চাকের ওপর। এটা কী রে বাবা? বোমা নয়তো? মারল সেখানে এক গুলি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভিমরুল উড়ে এলো। ফলস্বরূপ তিন মিলিটারি খতম এর ভেতর দিয়ে জন আবার মেজর।

ঠিক এই সময় আওয়ামী লীগ নেতার বিবেচনায় একটা বড়ো ভুল হলো। পিরোজপুর ট্রেনের থেকে আড়াই শত রাইফেল লুট হয়ে গেল। যার সুদূরপ্রসারী কুফল আওয়ামী লীগ নেতারাই দেখে গেলেন। পুলিশের সঙ্গে সম্পর্কও খারাপ হয়ে গেল জনসাধারণের। আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে মহকুমা পুলিশ প্রধান হিসেবে মতভেদ হয়ে গেল আঝ্জার।

বাইফের গুলি ছিল আমায়েরের। চিকিৎসা হয়েছিল তখন
 আমায়েরের গুলি দেওয়া হবে। তবে সমস্ত আমায়েরের
 সারা সত্যিকার অর্থেই সূত্র করতে প্রবৃত্ত। তাদের পাঠানো
 হবে বাগের মাঠে। সারা কপামার তীব্র তন EPR চমটা
 আছে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুলনার মেনিটরী
 দেয় উপর আক্রমণ চালাবে। স্থানীয় পুলিশ, বিভিন্ন
 থানা থেকে পুলিশি বাহিনী নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে
 সীমারে সারা মেনিটরী আক্রমণের সমুচিত জবাব
 দেওয়া যায়। এইকাল ওমানা আলোচনা সফর চমটে
 চিকিৎসার আক্রমণী লীগের জাতীয় পার্টির নির্বাচিত
 পদার্থ এখানে থেকে থেকে না তাকে লোক গিয়ে
 প্রিজারি থেকে করলেন। ২৬ জুন assumed police
 সারা প্রিজারি দিন রাত পাঠানো দিও জা কি বরবে
 ভেবে দেখেনা না। এরা দাঁড়ি হালেন সম্মানে
 বনলেন এই ভাবে সারা জাকাতের দ্বারা পাঠন জা
 স্থগিত হয়ে। বন্ধক আক্রমণ হিবুর। আমায়ের
 বিখ্যাত করে জাকাতের। বাইফের লিট হয়ে গেল।
 এরং মেই দিনই চমটা এও বরনী বাইফের জা
 দুই বছার হার্ডও গুলি কুল চলে গেল জাকাতের
 হাট। এরং বন বাপুল্য এর সফর পার্থক্যন সবার
 আক্রমণী লীগের এই ছুন চলে গেল সবার সূত্র হয়ে
 উঠল। প্রিজারি সারের ২৬ জুন পুলিশের সত্য
 দিও জা assumed police খালিচেনে গেল পার্থক্যন।

রাইফেলগুলো ছিল আনসারদের। ঠিক হয়েছিল সে-সব আনসারদের দিয়ে দেওয়া হবে। সেই সমস্ত আনসারদের, যারা সত্যিকার অর্থেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাদের পাঠানো হবে বাগেরহাটে। সারা রূপসার তীরে যে-EPR দলটা আছে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুলনার মিলিটারিদের উপর আক্রমণ চালাবে। স্থানীয় পুলিশ, বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ এনে নিজেদের ঘাঁটি সুরক্ষিত করে রাখবে যাতে মিলিটারি আক্রমণের সমুচিত জবাব দেওয়া যায়। এইরূপ আলাপ আলোচনা যখন চলছে ঠিক তখনি আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এনায়েত হুসেন শ তিনেক লোক নিয়ে ট্রেজারি ঘেরাও করলেন। ১৬ জন armed police যারা ট্রেজারি দিন রাত পাহারা দিত তারা কীভাবে ভেবে পেল না। আকবা দৌড়ে গেলেন সেখানে বললেন, এইভাবে রাইফেল ডাকাতির হাতে পড়ে মহা মুশকিল হয়ে যাবে বন্দুক আমরাও ধরব। আমাদের বিশ্বাস করো তোমরা। রাইফেল লুট হয়ে গেল। এবং সেই দিনই পঞ্চাশের বেশি রাইফেল আর দুই হাজার রাউন্ড গুলি চলে গেল ডাকাতির হাতে। এবং বলা বাহুল্য এর ফল পরখ করল সবাই। আওয়ামী লীগের এই ভুল চালে পুলিশ সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ট্রেজারি গার্ডের ১৬ জন পুলিশের মধ্যে দশ জন armed police পালিয়ে গেল পরদিনই।

শ্রাম ওয়াজ টার্নিং আউট ইপার্ট থেকে একজন দুইজন করে সুস্থিতা করতে থাকলো। আত্মা কি কবরের ভেবে পেলেন না। বহিষ্কারের এম পি জানালের ওয়াশিং করে সংস্থান পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পিরাজসুত্রে তখন চরম বিকৃত্যনা।

বাহিনীর হাতে ছেলের মত তর শূন্য বেরাচ্ছে। দোকান পাট মেডিক জোকু করে তিনিম পত মিলে আসছে। চাঁদা উঠানো হচ্ছে শুধু হাতে। ডাকতি শুরু হয়েছে আমে পামের প্রায় সম্বন্ধে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে নকশালবাদের বিরোধী উন্নয়িত হচ্ছে। নেতৃত্বের চিত্র নেই আওয়ামী বন্ধুক হাতে পোষা সবাই লেগে। ওয়াশিং জরুরি অবস্থায় হচ্ছে ডাক সজিত। বিদেশে বন্ধু নকশাল আওয়ামী লীগ বিরোধী আওয়ামী লীগে দু দলের উল্লেখ মধ্যম এক তখন এক আমুক তার। নকশালবাদের কথা হল আওয়ামীদের আনুষ্ঠানিক দৈনন্দিন। তারপর নকশালবাদের শুরু করুন তা মুক্তি সংগ্রাম বন্দুক হাতে গুলি করুন। চাঁদা পাহারা, পেট্রোল, কেবলিন চাল ডাল, তেল, মসুরা ইত্যাদি মাঝে মাঝে সবে হলে নাগরিক তাঁই তারা জানালে আগলো পর্বত প্রমাণ। পাহারায় বন্ধুক দৈনন্দিন। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সবাই। সরকারী অফিসাররা হল তাদের খেলার পুতুল। বন্ধুক হাতে তাদের দিমে মা ইঁদুর তা কবরে আসল। একটা ইদাওয়ার দিগ্ধ

থানা আর টাউন আউট পোস্ট থেকে একজন দুইজন করে পুলিশ সরতে থাকল। আকবা কী করবেন ভেবে পেলেন না। বরিশালের এস.পি জানালেন ওয়ারলেস করে সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মেনে চলেন।

পিরোজপুরে তখন চরম বিশৃঙ্খলা। রাইফেল হাতে ছেলেরা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানপাট থেকে জোর করে জিনিসপত্র নিয়ে আসছে। চাঁদা উঠানো হচ্ছে বড়ো হাতে। ডাকাতি শুরু হয়েছে আসেপাশের গ্রামগুলোতে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে নকশালদের বিরোধ ধূমায়িত হচ্ছে। নেতৃত্বের চিহ্ন নেই কোথাও। বন্দুক হাতে পেয়ে সবাই নেতা। অবস্থার অবনতি হচ্ছে দ্রুত গতিতে। বিশেষ করে নকশাল-আওয়ামী লীগ বিরোধ। আওয়ামী লীগ বলছে দু-দলের উদ্দেশ্য যখন এক তখন এক সঙ্গেই আসবে তারা। নকশালদের কথা হলো আমাদেরটা আমরাই দেখবু তারপর নকশালরা যা শুরু করল তা মুক্তিসংগ্রামকে বহুলাংশে সক্রিয় করল। টাকাপয়সা, পেট্রল, কেরসিন, চাল, ডাল, তেল, মশলা ইত্যাদি যার কথাই মনে হতে লাগল তাই তারা জমাতে লাগল পর্বতপ্রমাণ। সমস্তই বন্দুক দেখিয়ে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সবাই। সরকারি অফিসাররা হলো তাদের খেলার পুতুল। বন্দুক হাতে তাদের দিয়ে যা ইচ্ছা তা করাতে লাগল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বর ন তাঁর দিকে একান্ত নকশান হলে হামির
 বর বাসক। তাদের সবার হাতেই বাইসেন। কি চাই?

আমাকে দরকার। আমাকে তবড়িয়ে এলেন।

মঞ্জুর: চাচাজান (আমাকে চাচা জাকো তাদের সবার)
 আমাকে একটা নকশা কাজে এমনিই জাওয়ার কাণ্ডে

আমাকে কি বাক?

মঞ্জুর: আপনি আমাদের একটা প্রাইভেট টেলিকোমের
 গ্যারান্টি করে দেবেন আর আমাদের বম
 গ্যারান্টিমাটা আছে সেটা আমাদের দিয়ে
 দেবেন।

আমাকে বল কি?

মঞ্জুর: চাচাজান পেরি আমাকে করবেই হবে।

মাই হোক কোনও আমাকে ওদের একটা প্রাইভেট
 টেলিকোমের গ্যারান্টি করে দিলেন ইনক্রিমেন্ট হ্যা
 কে বলে। গ্যারান্টিমাটা অবশ্যই বুঝে গেল।

মাই হোক বন্ধুর হাতে হেলেনদের প্রমাণ হ্যা
 পংখরাজ করলে তাদের সন্তি ইমই বেহন
 বেজিন্টের ২nd লেনস্টেট জিয়া আবু একজন
 নেতার অফিসারের দান পুরই হেলী। বেসজিরিক
 দিক থেকে সাহায্য করলেন সোলী হামদা
 আর তরুর লেখা অফিসার ডিজালুর কুশনান

রাত ন টার দিকে একদল নকশাল ছেলে হাজির হলো বাসায়। তাদের সবার হাতেই রাইফেল। কী চাই? আঝাকে দরকার। আঝা বেরিয়ে এলেন।

ফজলু : চাচাজান (আঝাকে চাচা ডাকত তাদের সবাই) আমরা একটা জরুরি কাজে এসেছি আপনার কাছে।

আঝা : কী কাজ ?

ফজলু : আপনি আমাদের একটা প্রাইভেট টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দেবেন আর আপনাদের যে-ওয়ারলেসটা আছে সেটা আমাদের দিয়ে দেবেন।

আঝা : বল কী ?

ফজলু : চাচাজান সেটি আপনাকে দেয়াতেই হবে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত আঝা ওদের একটা প্রাইভেট টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার T & T-কে বলে। ওয়ারলেসটা অবশ্য রয়ে গেল।

যাই হোক বন্দুক হাতে ছেলেদের প্রথম যারা সংঘবদ্ধ করল তাদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 2nd লেফটেন্যান্ট জিয়া আর একজন নেভাল অফিসারের দান খুবই বেশি। বেসামরিক দিক থেকে সাহায্য করলেন আলী হায়দার খান আর তরুণ ফোর্থ অফিসার মিজানুর রহমান

Training Camp খোলা হয়। সু সংগঠিত করে সচিব
 কার্য আছে। ছান training দায়িত্ব হয়। কিছু
 ইতি মধ্যে বড় দেরি হয়ে গেছে। ঢাকার দান
 বন্ধুর হাতে প্রায় থেকে প্রায়ান্তরে অত্যন্ত
 চালিয়ে যাচ্ছে। অপর তখন নিজ মৌলিক ব্যাপার

আলী হাম্মদের খানের নেতৃত্বে মহকুমা
 সোভিয়েতীয় আন্টি কমিউন জেটে একটি কমিটি
 গঠন করা হয় তাই প্রায় প্রায় আন্টি কমিউন
 জেটে কমিটি গঠন করে বৈদ্যেত আসল।
 তাদের সভাপতির জন্য ছিল সুনির্ভর মতের বোটা
 যে দলটা বেছে নেবে তারই ছিল আলী হাম্মদ,
 কোটা ইন্সপেক্টর, দুজন এম. এ. কর্মসূচী, আলী
 হাম্মদ এর তখন নামের তখন আলী হাম্মদ ইতি
 মতই। ব্যাপারটা ছিল প্রায় প্রায় পিঠ
 বোটে প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায়
 প্রায়। অর্থাৎ এটি বৈদ্যেত একটি মত
 উদ্দেশ্যে ছিল মতই হয় প্রায় প্রায় প্রায়
 প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায়

দেখানামা ছিলেন তাই নিশ্চয়ই হয়
 প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায়
 ইতি মধ্যে। ঢাকাটা ছাড়া আরো অনেক
 কুৎসিত ব্যাপারও হচ্ছিল। উর্দুতে হাজারক
 চালিয়ে কাম কমিউন বৈদ্যেতের তার চালিয়ে
 ন্যাংটো করে দাড়া করে রাখা থেকে শুরু
 করে, সংগে করে নিজে মাংস ছিল খুব

Training camp খোলা হলো। সুসংঘবদ্ধ করে সত্যিকার অর্থেই ভালো Training দেয়া হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ডাকাতির দল বন্দুকহাতে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। খুন তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

আলী হায়দার খানের নেতৃত্বে মহকুমার অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্যে একটা কমিটি গঠন করা হলো। তারা গ্রামে গ্রামে শান্তি রক্ষার জন্যে রক্ষিবাহিনী গঠন করে বেড়াতে লাগল। তাদের যাতায়াতের জন্যে ছিল পুলিশের মোটরবোট। সে দলটা বেরুত তাদের মধ্যে ছিল আলী হায়দার, কোর্ট ইন্সপেক্টর, দু-জন আর্মড কনস্টেবল, আলী হায়দার এর ভাগ্নে বাদশা এবং আমি। বলতে বাধা নেই ব্যাপারটা হতো একটা প্লেজার ট্রিপ। স্পিডবোটে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগত। সুখী এই বেড়ানোর একটা মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল সেটি হলো গ্রামবাসীকে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে অবহিত করা।

দেখলাম হিন্দুদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছে। সমস্ত বড়ো বড়ো হিন্দুবাড়ি ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে। ডাকাতি ছাড়া আরো অনেক কুৎসিত ব্যাপারও হচ্ছে। উঠানে হাজারক জ্বালিয়ে কমবয়সী মেয়েদের তার চারদিকে ন্যাংটো করে দাঁড়া করে রাখা থেকে শুরু করে, সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ছিল খুবই

কনন।

বাতের বেলা সাহসে পায়ের দিতে হত। ছন্দ জলের
একটা সুপ করে বন্ধু হাতে সাহসে টুকুর ভারত হল
এই পায়ের কাপড়টা আমার হেমা-মাগত। নিজের
কাপড় পুঁজবে, আমার কাজের বেলা বেলা অচেনা
পর বাস্তা খাটে যাঁটছি। স্থান অচেনা পাবছে অথবা
হাতামে নারিকেলের পাতা কাঁপছে। অথবা স্নাত হেমা
মাগত।

জিহ্বা কের ক্রানি ভীষা শুধ বেগে সিগ্গেছিল
সমস্ত দির পাবে তার পুঁজাবে। তার অথবা হোপে
আমি অর্ধিত হবু ভক্তার ভাজলেন, অথবা পত্র হেমা
হল। অথচ আমা নিজেও পুঁজাভাস হয়ে সবেছি
নেই। বেগে পাবের না হতে পুঁজতে পাবের
না। অতি সামান্য অথবা ভীষা উৎকৃষ্ট হবু
পড়লেন। গলে আবে অর্ধিতকানী বেগে সাহে
আর্ট চীং অর্ধিত। সমস্ত শুধ অথচ সজছিলেন-

“...একদিনের এতটা আত্ম অর্ধিত, অর্ধিতনী
চেলেবে, স্থায়ীকার। তার সান নন অর্ধিতক
তথ্য সৃষ্টির বলেছেন বহুত মানুষের কথা
....”

অতি সাধারণ আবেগের কথা শুনে তাঁর হৃদয়ে আত্ম
হেমা দিতে টিপটোল করে পানি পাবছিলো।

কমন।

রাতের বেলা শহরও পাহারা দিতে হতো। ছয় জনের একটা গ্রুপ করে বন্দুক হাতে শহরে টক্কর মারতে হতো। এই পাহারার ব্যাপারটা আমার বেশ লাগত। নির্জন শহর ঘুমিয়ে, আমরা ক-জন জেগে জেগে অচেনাসব রাস্তা-ঘাটে হাঁটছি। স্নান জোছনা পড়েছে শহরে, বাতাসে নারিকেলের পাতা কাঁপছে। অল্প শীত বেশ লাগত।

শিখু কেন জানি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিন পড়ে পড়ে ঘুমাত। তার অবস্থা দেখে আক্বা শঙ্কিত হয়ে ডাক্তার ডাকালেন, অমুখ পত্র কেনা হলো। অথচ আক্বা নিজেও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। খেতে পারতেন না, রাতে ঘুমতে পারতেন না। অতি সামান্য খবরেও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। মনে আছে আকাশবাণী থেকে সাড়ে সাতটায় অধ্যাপক সমর গুহ যখন বলছিলেন—

‘... বাঙালির একটি মাত্র অপরাধ, বাঙালি চেয়েছে, স্বাধীকার। জনগণ-মন অধিনায়ক শেখ মুজিব বলেছেন বঞ্চিত মানুষের কথা ...’

অতি সাধারণ আবেগের কথা, তবু তাই শুনে আক্বার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছিল।

আম্মা কিছু খুব নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলতেন
 "সে যাঁই হোক, আমাদের কাছেই হবে।" তিনি
 খুব দুঃস্বপ্ন মতোই একথা বলতেন এবং আম্মা
 তাঁর কথা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতাম। তার
 কারণও ছিল। আম্মার 'জীবিত জীবন' স্মৃতিজ্ঞা ছিল
 পার্থক্যে ছিল। ভবিষ্যতের প্রায় ঘটনাই আসে আসে
 টের হত। আম্মার অলঙ্কার তাঁর এই স্মৃতি
 প্রমাণ করে আমাদের বিশ্বাস করেছেন। তার একটি
 উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

আম্মা দুপুরে দান তৈরি করতে
 এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। বলতেন
 "সে রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। একটি
 বাচ্চা মেয়ে আমাকে বলল 'বলো আমাকে চিনতে
 না? আমি বুঝতে পারিনি। আপনাদের এখানে
 থাকার কক্ষের দরজা খোলা আছে যত্নে পদা পরিষ্কার
 বাচ্চা মেয়ে এসে দুকে বললো 'না বুঝতে
 পারিনি', এখানে কয়েকদিন থাকতে এসেছে।
 খেঁচা আম্মার আশ্চর্যের সঙ্গে আম্মা বিশ্বাস করেছিলেন।
 এমনকি আম্মা পার্থক্য বকচকিটে নিশ্চিত ছিল।
 আম্মার এই স্মৃতিজ্ঞার জন্যেই তাঁর ওপর আমাদের
 বিশ্বাস ছিল প্রখর। তাঁর স্মৃতিজ্ঞা জারো
 একটি কথা বলবার লোক সামান্যে পারতেন।
 তিনি কেথায়ও ছিল না সেখান থেকে নির্মিত
 ফুলের সন্ধান দেতেন। আম্মার দোঁটোর লোক
 তা লোক। তাদের দুজন স্মৃতিজ্ঞা এইটুকু না

আম্মা কিন্তু খুব নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলতেন ‘সব যাই হোক, আমাদের কিছু হবে না।’ তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই এ-কথা বলতেন এবং আমরা তার কথা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতাম। তার কারণও ছিল। আম্মার ‘ক্ল্যারিওভ্যানসি’ ক্ষমতা কিছু পরিমাণে ছিল। ভবিষ্যতের প্রায় ঘটনাই আগেআগে টের পেতেন। আগেও অনেকবার তার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদের বিস্মিত করেছেন। তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

আম্মা দুপুরে পানটান খেয়ে পালঙ্কে বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন। বলছেন, ‘গত রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। একটা বাচ্চা মেয়ে আমাকে এসে বলছে আমাকে চিনছেন না? আমি রাবেয়ার মেয়ে। আপনাদের এখানে থাকতে কয়েকদিন।’ বলা শেষ হতেই পর্দা সরিয়ে বাচ্চা মতো একটা স্ত্রীমুখে ছুকে বলল সে রাবেয়ার মেয়ে, এখানে কয়েকদিন থাকতে এসেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। এমনকি এই ক্ষমতার জন্যেই তার ওপর আমাদের বিশ্বাস ছিল প্রখর। তাঁর সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি কোথাও কিছু নয় অথচ খুব মিষ্টি ফুলের গন্ধ পেতেন। আমার ছোটোবোন শেফুও তা পেত। তাদের দু-জন সম্বন্ধে এইটুকু কথা

বলা চলে যে, দু-জনই চূড়ান্ত রকমের ধর্মনিষ্ঠ। ধর্মের সব অনুশাসনই যে শুধু গভীরভাবে বিশ্বাস করত তাই নয়, যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে পালনও করত।

প্রথম দিককার কথায় ফিরে আসি। আমাদের সাফল্যের প্রথম দিনগুলোতে যখন স্বাধীন বাংলা বেতার, কলকাতা বেতার, BBC, VOA, আর রেডিও অস্ট্রেলিয়া একটির পর একটি সাফল্যের খবর দিচ্ছে, ঠিক তখনই একটা খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। টিক্কা খান ইজ ডেড। টিক্কা খান হাস গন। খবরটা এসেছে মগবাজার থেকে চাঁদপুর টেলিফোনে। টেলিফোন অপারেটররা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। থানায় আব্বাই প্রথম এ-খবর রিসিভ করে খুশিতে নাকি 'জয় বাংলা' বলে লাফিয়ে উঠলেন। মস্ত মিছিল বেরুল ই.পি. আর এর গুলিকে টিক্কা খান মরেছে। দু-একজন গরিব-দুঃখীদের পয়সা বিলালো এই উপলক্ষে। বিকেলের দিকে টিক্কা খানকে কীভাবে মারা হলো সে সম্বন্ধে অদ্ভুতসব গল্প নাজিম ভাই আনতে লাগলেন—

‘ই.পি. আর এর মেজর

আব্দুল গফুর মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে
সটান ঢুকে পড়েছিল টিক্কা খানের কনফারেন্স
রুমে। ঢুকেই গুলি। সে নিজেও আর
বেরিয়ে আসতে পারে নাই।’

BBC থেকেও যখন বলা হলো টিক্কা আহত। তখন টিক্কার মৃত্যু সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ হয়ে বুকে হাতির বল পেল।

বাঙালির প্রতিরোধে ভাঙন ধরল ক্রমে। আকাশপথে জলপথে সৈন্য আসতে লাগল। যুদ্ধজাহাজ ইফতিখার আর বাবর থেকে ক্রমাগত শেল বর্ষিত হতে লাগল। বাঙালি অধিকৃত বন্দর চাটগাঁয় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মুহূর্মুহু বিদেশের বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানানো হতে লাগল। বলা হতে লাগল যার যা অস্ত্র আছে নিয়ে এগিয়ে আসুন। এমনকি খুস্তি, দা, কুড়াল, মরিচের গুঁড়া। শুনতে শুনতে দুঃখে চোখে পানি এসে যায়, ভাবি কতটুকু অসহায় হলেই না এমন বলা যায়।

পিরোজপুরের কথা বলতে গেলেই আরেকজন এর কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে হচ্ছে প্রাক্তন আমেরিক বাহিনীর একজন গেরিলা যুদ্ধের trainee. তার নাম* মনে নেই। এইখানে তাকে গেরিলা বলেই উল্লেখ করব। লোকটার গড়ন হালকা পাতলা, পেটা শরীর, চোখের তারা বেড়ালের মতো, বেশ লম্বা, গায়ের বর্ণ গাঢ় কালো। প্রথম থেকেই তার উন্মাদনা ছিল আকাশ ছোঁয়া। মুক্তিবাহিনীর সংগঠনে তাদের ট্রেনিং হওয়ানোয় সে মেশিনের মতোই খাটছিল। তার ৬ জন বিশ্বস্ত অনুগামী নিয়ে সে একটা গেরিলা স্কোয়াডও করেছিল। সবার আস্থাও সে অর্জন করেছিল। কি করে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

* নাম সম্ভবত হাশেম।

সবাই খুনিমে বসেছি, হাত হবে তিরটে। গোগিনা এম
কড়া নাহলে। দরজা খুলে দিলেম আমি। "কি
ক্যাপার?" ক্যাপার খুব গুরুতর টেজারী খুঁট কববার
জন্মে আলী হামদার নাকি তার দলবল নিয়ে ধুরে
বেড়াচ্ছে। ওরা ফিল্ড খুঁজে তার বসতি শুনছেন।
মে বলে চলল, "স্যার আমি টেজারীর পানোর
বুট্টা নিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ আলী হামদার
আমায় পল্ট বলে ধাক্কা। দেখি আলী হামদার
তার জনকমু বস্তু নিয়ে টেজারীর চারপাশে
ধুরে ধুরে করছে। আলী হামদার বলাবল এ কথা
দেখে অন্য বাস্তু। আমি অন্য বাস্তু
দৌড়ে আপনার কাছে এমেছি। ওরা তার
মিনিম্যারিটিন জন্মে তার কাঁধে হাত বেলে
তাকে ধরতে দিলেন। তারপর বলাবল, "আলী
হামদার টেজারী বস্তু জন্মে এই জাহাঙ্গীর
নিয়েছে। আপনাকে আশোচনা করছে এটা
স্বিক করা হলেও চিন্তা কিছু নেই। পরদিন
ভোরে গোগিনা আবার এফল। বিশম
উৎকৃষ্ট। আমার হিনোতের সাত্তীত করে
এমেছে। উৎকৃষ্টার কাছাকাছি মে একজন
স্বামী হিরে হেনেছে। একে মেয়ে হেনেবে
কিনা তাঁই নিয়ে পরামর্শ করছে এমেছে।
আবার সঙ্গে। ওরা শুরু বলাবল এ কথা
স্বামী বলাবল কি করে? এবার মে একটি

সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে, রাত হবে তিনটা। গেরিলা এসে কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিলাম আমি। ‘কী ব্যাপার?’ ব্যাপার খুব গুরুতর। ট্রেজারি লুট করবার জন্যে আলী হায়দার নাকি তার দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আক্বা চিন্তিত মুখে তার বক্তব্য শুনছেন। সে বলে চলল, ‘স্যার আমি ট্রেজারির পাশের রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ আলী হায়দার আমায় হল্ট বলে থামাল। দেখি আলী হায়দার তার জনাকয় বন্ধু নিয়ে ট্রেজারির চারপাশে ঘুরঘুর করছে। আলী হায়দার বলল এ-রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় যেতে। আমি অন্য রাস্তায় দৌড়ে আপনার কাছে এসেছি। আক্বা তার সিনসিয়ালটির জন্যে তার কাঁধে হাত রেখে তাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বললেন, ‘আলী হায়দার ট্রেজারি রক্ষার জন্যেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে। আলাপ-আলোচনা করেই এটা ঠিক করা হয়েছে চিন্তার কিছু নেই। পরদিন ভোরে গেরিলা আবার এলো। বিষম উত্তেজিত। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে করে এসেছে। উত্তেজনার কারণে সে একজন স্পাই ধরে ফেলেছে। একে মেরে ফেলবে কি-না তাই নিয়ে পরামর্শ করতে এসেছে আক্বার সঙ্গে। আক্বা শুধু বললেন-এ যে স্পাই বুঝলেন কী করে? এবার সে একটি

শ্রেণীর কর্তৃত্ব। "সত্যের জ্ঞানবাহিত হুটো বিচ্ছিন্নকার
 একটা আলাকে দিয়ে দেন যদি তবে আমি গেরিলা
 মুক্তি কাজে লাগাতে পারি।" আত্ম পরিষ্কার
 না বলে দিলেন। সাহিলা চলে গেল। আমার
 মনে হুটা কাজটা মুক্তি চিক হুটা না। আমারকে
 কলকাতা সমস্ত বাহিন্যের প্রধান হাটের হাটের প্রধান
 বাহিনী একটা বিচ্ছিন্নকার কি আত্ম হুটি করবে।
 সে গেরিলা হাটের বিচ্ছিন্নকার সত্যি করে আত্ম
 নে কাজে লাগাতে পারবে, হুটা বিচ্ছিন্নকারের
 জ্ঞানবাহিত প্রকৃতকর নেই। তা হুটা গাঁদা হাটের
 হুটো কাজে সত্যি নিজে বেঁচে থাকতে
 হলে এদের হাট হুটা হুটা। জন্ম আমার
 মুক্তি উল্লাহ গেরিলাকে ডেকে পাঠিয়ে
 নিজের personal বিচ্ছিন্নকার হুটার ৬ বাহিনী মুক্তি
 দিয়ে দিলেন। তাঁর চাকরি জাহলে জাহলে
 কখন কখন প্রথম হুটো একটা কর্তৃত্বের প্রমাণ
 করলেন। কোন কোন কখন পারে বনটি।

এদিকে লোক মুক্তিবাহিনী গেরিলা নিয়ন্ত্রণ
 হুটুনে হে হে হুটুনে। বাহিনী বাহিনী বনটে
 তিনি হুটুগেরিলা হুটুনি তিনি সমস্ত মুক্তি সংগঠন
 পরিচালনা করছেন। আলাকবানী কখন ২০ মে
 হুটুগেরিলা হুটুগেরিলা বিভিন্ন বেতার থেকে তাঁর
 কখন কখন গিরিগুহে। ১৯৫৫ একজন জাপানী

প্রস্তাব করল। ‘স্যার আপনারতো দুটো রিভলবার, একটা আমাকে দিয়ে দেন যদি তবে আমি গেরিলাযুদ্ধে কাজে লাগাতে পারি।’ আব্বা পরিষ্কার না বলে দিলেন। গেরিলা চলে গেল। আমার মনে হলো কাজটা বুঝি ঠিক হলো না। আব্বাকে বললাম, সমস্ত রাইফেল যখন তাদের হাতে তখন বাড়তি একটা রিভলবার কি আর ক্ষতি করবে। সে গেরিলা ফাইটার। রিভলবার সত্যিকার অর্থেই সে কাজে লাগাতে পারবে, দুটো রিভলবারেরও আপনার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া ওদের হাতেই ক্ষমতা কাজেই সম্প্রীতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে এদের হাতে রাখা কর্তব্য। আব্বা আমার যুক্তিতে টলে গিয়ে গেরিলাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজের Personal রিভলবারের ৬ রাউন্ড গুলি দিয়ে দিলেন এবং তার চাকরি জীবনে অন্যতম কথা শুনে এই প্রথম হয়ত একটা বড় ধরনের ভুল করলেন। সে কথার পরে বলছি।

এদিকে শেখ মুজিবের গ্রেফতার নিয়েও তুমুল হইচই হচ্ছে। স্বাধীন বাংলা বলছে তিনি গ্রেফতার হননি, তিনি সমগ্র মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। আকাশবাণী বলছে ২৫ শে মার্চের পরেও বিভিন্ন বেতার থেকে তার কণ্ঠ শোনা গিয়েছে। BBC-র একজন জাপানি

স্বাধীনতার উদ্ভূতি দিয়ে বললো তিনি রমজানা
 প্রসঙ্গের কথা কি। বয়স বৃদ্ধির গুণের জন্য মাঝে মাঝে
 মন্থনে কেঁচু বললো আমি বি ব্রাহ্মণের আর্থ, জি
 আগেরই সত্যের কথা জানতে গেলে তাঁকে
 পরিচয় দেবে। কেঁচু বললো দুজন বেলুন
 রেজিমেন্টের বেসজর বাত নটোর দিকে তাঁকে
 নিয়ে সরে পড়েছে। যদিও ~~কিছু~~ ~~কিছু~~
 স্বাধীনতার স্থানের কথা অনুমান করে
 পুঞ্জির প্রসঙ্গের মধ্যেই একই বললেন
 তাঁর প্রতিক্রমিত যে আমি যদি বিরা
 না দেই তবে আমার সঙ্গে সতর্কতাকা
 শুধু মত করে দেখবে। চৈ প্রসঙ্গের সত্যতা
 জানো।

এছাড়া মাঝে মাঝে এলো মনোভাব
 sector সাধারণ সৈন্য বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে
 চলে গিয়েছে। চিত্রসাহ থেকে বাৎসর
 বাহিনী সরে গিয়েছে। হিন্ডীর জোয়ারকা
 গান বোটে করে চুকে পড়েছে প্রাসঙ্গ
 তির। কোন মতে ~~কিছু~~ হয়ে যাচ্ছে একটু
 পর একটু অরস। পাকিস্তানের অগ্রাচরণে
 চিত্র দেখতে পারছি। নদীর স্রোতের মত
 লোক আমলে পানিয়ে পুনরায় থেকে।
 তাদের দুঃখ কষ্টের জার হাজার কথা
 বর্ণনা নাহি করলাম।

সাংবাদিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলল তিনি হয়ত-বা গ্রেফতার হন নি। বছরকম গুজব শোনা যায় তার সম্বন্ধে। কেউ বলছে আই বি ব্রাঞ্চার আই, জি আগেই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাকে সরিয়ে ফেলেছে। কেউ বলছে দু-জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর রাত ৯টার দিকে তাকে নিয়ে সরে পড়েছে। যদি সাংবাদিক গ্রিনের কথা অনুযায়ী শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়েছেন এবং বলেছেন তাঁর প্রতিবেশীকে যে ‘আমি যদি ধরা না দেই তবে আমার খোঁজে সমস্ত ঢাকা তছনছ করে ফেলবে, এরচে গ্রেফতার হওয়াই ভালো।’

এমনি সময় খবর এলো যুক্তরাষ্ট্রের sector পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। চিটাগাং থেকে বাংলা বাহিনী সরে গিয়েছে। নেভির জোয়ারকর গানবোটে করে ঢুকে পড়েছে গ্রামের ভিতর। শেলবর্ষণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একটির পর একটি জনপদ। পরোক্ষভাবে অত্যাচারের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। নদীর শ্রোতের মতো লোক পালিয়ে আসছে খুলনা থেকে। তাদের দুঃখ-কষ্ট আর হতাশার কথা বর্ণনা নাই-বা করলাম।

হাতে তাল খুন হইয়া। বিকট সব দুঃস্থল দেখি।
 প্রাণে মাকে উঁকো খবর জানে মেলিটোরী জাহাজে
 পলায়নহাটে তিক্তে। শুনে আসক্তে বুকেরে রূপ কমে
 যায়। কি করা যায় তবে পাঠি না। শাহরুর
 মোকদ্দম একে ধরে বেড়ায়। অপ্রকার বাসি
 ত্যাকর দুর্ভাগ্যের স্তম্ভ বুকেরে উপর চেপে
 কুঁড়ে বসে। আমার চোর হুম আমার জানে
 বাসি। এই বিজিৎকার মর্শিও একটা আশার
 খবর পাওয়া হলে হইত। আকাশবানীর প্রজতি
 সত্বাদে বনা হন -
 প্রেমিতের পদশেখি হুমায়ূর কাছে ত্রিগাহ
 চিঠি পাঠিয়ে সনহুয়া বন্ধ করে বাস্তবিক
 পরামর্শ দিতে বলেছেন। বাবুলার অক্সিমাচারি
 মোতা ময়মুক্তিবের জীবনের নিরাপত্তা মশকী
 উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন। 'আব্বা মুচিন্দু
 ছিলেন তাকে খুন থেকে রক্ষা করে
 এই খবর শুনানাম। সুখের তাঁর চেয়ে
 মুখ থেকে দুখিন্দার ছায়া অপসারিত হইয়া
 বননের 'এইবার 'হুমায়ূর টাইট হের'
 আর আমারেও জন্ম নাই।''

রাতে ভালো ঘুম হয় না। বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখি। মাঝে মাঝে উড়োখবর আসে মিলিটারিজাহাজ ছলারহাটে ভিড়ছে। শুনে আতঙ্কে বুকের রক্ত জমে যায়। কি করা যায় ভেবে পাই না। শহরের লোকেরা অস্ত্রে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকার রাতি ভয়াবহ দুর্যোগের মতো বুকের ওপর চেপে বসে। আবার ভোর হয়, আবার আসে রাত্রি। এই বিভীষিকার মধ্যেও একটা আশার খবর পাওয়া গেল হঠাৎ। আকাশবাণীর প্রভাতী সংবাদে বলা হলো— ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগের্নি ইয়াহিয়ায় কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে গণহত্যা বন্ধ করে রাজনৈতিক সমাধান করার তে বলেছেন। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।’ আবার ঘুমিয়ে ছিলেন, তাকে ঘুম থেকে জেগে তুলে এই খবর শোনালাম। অহুতে তার চোখমুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া অপসারিত হলো, বললেন— ‘এইবার ইয়াহিয়া টাইট হবে। আর আমাদের ভয় নাই।’

পুরানো স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে চোখ পানিতে
 ভরে উঠে। একটু মুসতীর বেদনা অনুভব করি।
 প্রেমিহৃৎ পদসানির্ চিহ্নে কোন কাজ গুণি।
 তবে আমাদের চরম হতাশায় বৃহৎ আকিষ্কামি
 ধর্মের ভারী প্রথম খোলাখেলি তবে আমাদের
 কথা বলেছে। তাদের মহাবুদ্ধিগুণিত পোহেছি।
 তাঁই তাদের প্রতি জ্ঞান আমাদের অনেকভাষ্যদে
 অনেক হৃৎকতা। জন্ম জাতিসেত ইতিমমর। জন্ম
 মোতিমেত ইতিমিলের বীর ভারতান।

দুদিন পরের কথা রাহি কানিন
 তিউটি মেয়ে মিরছি। মনে আলী হাম্বদর,
 তার ভাগ্যে বাদকা, নকশা পোর একটা হুঁজ।
 বাও হুঁজ আরাইটা। বাবা বাসাম্ আধা
 অনটে, বশার অনেক লোকের জিউ।
 আমাদের পক্ষে অনেক আস্থা হবতিসে এলো।
 আমাদের হুঁজ মেখে জিউশ খুঁশী প্রচন সোপের
 আমা তিউয়ে আমা বলে ডাকলেন। আলী
 হাম্বদর— দিকে ফিরে বললেন:— হাম্বদর মায়ের
 একটা কাপার হুঁজ, কান আপনার মনে
 আল্লাপা হবে। আশার মুখে দিকে তাকিয়ে
 ধনে হুঁজের হাঁর বুক স্মেতে একটা গুঁঠ
 বোকা মেয়ে গেছে।

পুরোনো স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে চোখ পানিতে ভরে ওঠে। একটা সুগভীর বেদনা অনুভব করি। প্রেসিডেন্ট পদগর্ভির চিঠিতে কোনো কাজ হয়নি। তবে আমাদের চরম হতাশায় বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে তারাই প্রথম খোলাখুলিভাবে আমাদের কথা বলেছে। তাদের সহানুভূতিটুকুতো পেয়েছি। তাই তাদের প্রতি আজ আমাদের অনেক ভালোবাসা, অনেক কৃতজ্ঞতা। জয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। জয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর জনগণ।

দু-দিন পরের কথা। রাত্রিকালীন ডিউটি সেরে ফিরছি। সঙ্গে আলী হায়দার, তার ভাগ্নে বাদশা, নকশাল গ্রুপের একটি ছেলে। রাত হবে আড়াইটা। দেখি বাসায় আলো জ্বলছে, বসার ঘরে অনেক লোকের ভীড়। আমাদের পায়ে শব্দে আকবা বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন, ‘আয়, ভিতরে আয়’ বলে ডাকলেন। আলী হায়দারের দিকে ফিরে বললেন, ‘হায়দার সাহেব একটা ব্যাপার হয়েছে, কাল আপনার সঙ্গে আলাপ হবে।’ আকবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল তাঁর বুক থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেছে।

একান্তর এবং আমার বাবা

লেখকের লেখা ৫০ নং পৃষ্ঠা

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ

পাতাটি হারিয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

কামিন আপনিসে আমাকে প্রায়শ্চৈত্নে বিভিন্নবার
 দিচ্ছেন এটা সে জেবেছে এবং সে মনে
 কল্পে সে বিভিন্নবার দেখা হলেও তাকে পুণ
 করার জন্যে।" সোফিয়া জাবো বললে, "আপনার
 দেখে সে তার মনে বলে গিয়েছে তাকে
 মনও মনবে মনবে, আজ স্নাতকই মানুষের কথা
 জাবো টেলিফোন ৩.৫ মাহেবেই হাতে দিলে
 বললেন। দর্শন হলে বললেন সোফিয়া কে
 মনবে করে বিভিন্নবার আর স্নাতক স্নাতক
 বিকল্পে করছে। ০.৫ জানাল মাত্র তিন
 বাঁধে স্নাতক পাঠে গেছে। বাকি স্নাতক
 সে প্রাক্ষিপ্ত করেছে। আমায় বললেন
 বিকল্পে সে স্নাতক করে আসে মনবে।"

আমার মনে কি জবাব হন তা
 আমিই জানি। স্নাতক ক্যাপটুরে জন্যে আমিই
 দায়ী। জাবো আমাকে কিছুই বললেন না।
 হাতে ফোটা পুস্তক হল না। স্নাতক
 টুট কট করলাম, আর স্নাতক বললাম, "আপনার
 ছুটি মনু কর এই নিম্নে আর মন হকান
 নতুন কামেলা না হন।" মনে শুধু এই কথা
 স্নাতকের আঘাতে স্নাতক একটি নাম দেহিঁয়ে
 পাবে।

মোম দর্শন মন্ত্রি একটা নাম পাঠে
 গেল। সোফিয়া। পুণ কবেছে
 ছুটি মনবে। তাকে দর্শন কর হন।

‘কারণ আপনি যে আমাকে প্রাইভেট রিভলবার দিয়েছেন এটা সে জেনেছে এবং সে সন্দেহ করছে যে, রিভলবার দেয়া হয়েছে তাকে যুদ্ধ করার জন্যে।’ গেরিলা আরো বলল, ‘আপনার ছেলে যে তার সঙ্গে রাতে গিয়েছে তাকেও হয়ত মেরে ফেলবে, আজ রাতেই মারবার কথা’। আক্কা টেলিফোন o.c. সাহেবের হাতে দিতে বললেন। দেওয়া হলে বললেন গেরিলাকে এরেস্ট করে রিভলবার আর গুলিগুলো রিকভার করতে। o.c. জানাল মাত্র তিন রাউন্ডগুলি পাওয়া গেছে। বাকি গুলি নাকি সে প্র্যাকটিস করেছে। আম্মা বললেন নিশ্চয়ই সে গুলি করে কোনো মানুষ মেরেছে।

আমার মনের যে কি অবস্থা হলো তা আমিই জানি। সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্যে আমিই দায়ী। অথচ আক্কা আমাকে কিছুই বললেন না। রাতে এক ফোঁটা ঘুমও হলো না। সারারাত ছটফট করলাম, আর শুধু বললাম, ‘আল্লা তুমি দয়া কর, এই নিয়ে আর যেন কোনো নতুন ঝামেলা না হয়।’ মনে ভয় এই বুঝি বুলেটের আঘাতে মৃত একটি লাশ বেরিয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি একটা লাশ পাওয়া গেল। খুনি গেরিলা। খুন করেছে ছুরি মেরে। তাকে গ্রেফতার করা হলো।

সেদের কথা বাস দিয়ে তখন স্বর্ন নিবোধের কথা
 চাওতে আসলাম। আত্মার মাতে কোন বিপদ না
 ২৪ স্বর্ন সেই মর্মানীত করতে আসলাম। খনে
 আত্মরে এই স্থিতি মে কোন কিছু বলে আত্মকে
 জড়িতেরে দেবে। কোন পর্যন্ত (চৌধুর জমিলের
 নির্দেশে বেরল বেরজিমেশ্বর একজন সুবাদার
 সোভিয়ার কাগজের মবনিকা পাতন থা। তার
 নাম নিতে দেখে এলো না। কোন্ প্রকারের
 কবর খনন কর দিল হাকে। পরদিনই কবর
 দেখে নাম খুলে মেলান। সোভিয়ার কবর গুলে
 করে খুলে বেরতে আসলো মাদর মন।

এই সময়ই পাকিস্তান রাষ্ট্র
 নির্বিচারে হামাধর্ষণ চললো, বঙ্গলা,
 মিলেট, চিতাগং, কামাং ব্রাহ্মণরাষ্ট্র
 মাদর কবর আর দিতাজপুর্ন। স্বাধীন
 বাংলা দেশে সজা, সোভিয়ার লোক আসলে
 খুলনা থেকে, এই স্রোতে এসে পরলেন
 কখন প্রাণ তার জড়িকে নিয়ে। আর খুলনা
 ইয়ে বনলেন, "খনে লেবে হোমক। মা
 হামার স্কুলে একটা কাজে সুখ দোখাছিল
 হোমাদে নিলে। সমগ্র্য খের স্কুলের
 তার কাছ থেকে মেশুরি জিনি সমগ্র
 জড়িতেরে নিলে বেরলেন। তার দু'জনে

দেশের কথা বাদ দিয়ে তখন শুধু নিজেদের কথাই ভাবতে লাগলাম। আক্কার যাতে কোনো বিপদ না হয় শুধু সেই দোয়াই করতে লাগলাম। মনে আতঙ্ক এই বৃষ্টি যে-কোনো কিছু বলে আক্কাকে জড়িয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত মেজর জলিলের নির্দেশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সুবাদার গেরিলাকে গুলি করে হত্যা করা হয় হত্যাপরোধে। গেরিলা কাহিনির যবনিকাপতন হলো। তার লাশ নিতে কেউ এল না। শেষে আনসাররাই কবরখানায় কবর দিলো তাকে। পরদিনই কুকুর সেই লাশ তুলে ফেলল। গোস্তের টুকরা মুখে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরময়।

এই সময়ই পাকিস্তানবাহিনী নির্বিচার বোমাবর্ষণ করে চলল, বগুড়া, সিলেট, চিটাগাং, ময়মনসিং, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর, কুষ্টিয়া আর দিনাজপুরে। স্বাধীন বাংলা বেতার স্তব্ধ, স্রোতের মতো লোক আসছে খুলনা থেকে, এই স্রোতেই এসে পড়লেন রহুল মামা তার ভাবিকে নিয়ে। আক্কা খুশি হয়ে বললেন, 'এসে পড়েছ তোমরা। যাক হাজার শুকুর একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাদের নিয়ে। অসংখ্য খবর গুনলাম তাঁর কাছ থেকে, যেগুলো তিনি সযতনে ডাইরিতে লিখে রেখেছেন। তার দু-একটা

২২ স্বপ্নের:-

- * বাবা একটু পানি দেননি? ২৭ মে মার্চ আমলের
আব্বা ঢাকা থেকে জম্মুদেরপুরে যাতায়েন। রাজ্য অসংখ্য
পুত্রদের ইচ্ছা: বিচ্ছিন্ন। তার তির থেকে এই কথা কী
একজন আর আমলের আব্বাকে লক্ষ্য করে কখন। তিনি পানি
না দিয়েই পানিয়ে আসলেন। কখন মেলিটোরাও তার
দিকে তাকিয়েছিল এবং তারা চাওয়া বাসানো থাকানো
দেখা করুক।
- * পুত্রের একটি কামজিদে কজন লোক নামাজ
পড়ছিলো। বাহুরে পোশাকালের মতক বেরিয়ে আসে
আঁকে আঁকে হুলেটে উড়ে আসে তা দেয় উল্লস।
ইমামাতিক বিপারলিক অব পুত্রের।
- * ভদ্রলোকের নাম জাতি বিশ্বাস। T.B. Clinic
জাতি। মেলিটোরাও পানিয়ে বেরিয়েছিলো। প্রাণে
সিঁদুর পরতে পারেন না, প্রাণে আঁখা লোম্বাও লেই
মাত্রে মদের না হুং মে মে হুই। বকৌদিন
পানিয়ে মাত্রে না পেরে মোম মোম পুসনকর
হুং হুগলেন। এখন তিনি মোহাম্মদ ইয়াহুয়র আরা।
- * একটি কুকুরকে দেখানাম একটি কৃষকের টেনে
নদীর পানি থেকে শুকনাম উঠিয়ে পুত্র হুগলেন
নেজ দুহিলে দুহিলে আছে। মামাম পারিষ্টান।

এই ধরনের :

বাবা একটু পানি দেবেন? ২৭ শে মার্চ আলমের আব্বা ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাচ্ছেন। রাস্তায় অসংখ্য মৃতদেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আর ভিতর থেকে এই কথা কটি একজন আহত আলমের আব্বাকে লক্ষ্য করে বলল। তিনি পানি না দিয়েই পালিয়ে আসলেন। কারণ মিলিটারিরা তার দিকে তাকিয়েছিল এবং তারা চায়না বাঙালি বাঙালিকে দয়া করুক।

খুলনার একটি মসজিদে ক-জন লোক নামাজ পড়ছিল। বাইরে গোলমালের শব্দে বেরিয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট উড়ে আসে তাদের ওপর। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান।

অদ্রলোকের নাম আই.সি. বিশ্বাস। T.B. clinic-এর ডাক্তার। মিলিটারির ভয়ে পালিয়ে পিঁড়াছিলেন। স্ত্রীকে সিঁদুর পরতে দিতেন না, হাতে শাঁখা-নোয়াও নেই যাতে সন্দেহ না হয় যে, সে হিন্দু। বেশিদিন পালিয়ে থাকতে না পেরে শেষমেষ মুসলমান হয়ে গেলেন। এখন তিনি মোহাম্মদ ইয়াকুব খান।

একটি কুকুরকে দেখলাম একটি মৃতদেহ টেনে নদীর পানি থেকে শুকনায় উঠিয়ে পরম তৃপ্তিতে লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে খাচ্ছে। সাবাস পাকিস্তান।

পিবোত্রপুত্রের দ্বিতীয় পুনর্নির্মাণ করলেন ইঞ্জিনিয়ার মামুন। থাকে
 গার্লো তার একটি অংশই দেখে গে অবস্থান।
 অবস্থানটি যে নির্মাণের চালাচ্ছে তার খবর আমাকে
 বন্ধন। বন্ধনীর sentimentality আশ্রয় হয়ে কল্পনা।
 হাজার বিহারীটা সেই আশ্রয়কে প্রকল্পিত করেন সুরী।

পিবোত্রপুত্রের কিছু অবস্থান পত্রিবার ছিল।

তাদের নিয়োগের জন্যে কল্যাণে নেতৃত্ব দেন। এর
 উচ্চতা হলেন আলী হামুদুর খান আর আফ্রা নিজে।
 পুনর্নির্মাণের মধ্যে একত্র পত্রিকা পত্রিকা বন্ধনীর
 ছিল, তবে পুনর্নির্মাণে স্থানা বন্ধনীর। ০৫ সাহেবের
 বাসায় তার নিয়োগের জন্যে আফ্রা বিলাস হার্টে উদ্ভিষ্ট
 ছিলেন। মিজের SDPO সাহেব তার অনেক আগেই অ.৩
 আঁচ করে বন্ধনীর SDPO এর বাসায় আগ্রস্ত নিয়োগে।
 সন্তের দ্বারা টেক্সটের জন্যে একবার কল্পনেন
 বন্ধনীর বন্ধনীর নাম

"তান আছে SDPO সাহেব?"

"জি, আপনি এল?"

"আছি আর কি। আপনারকে একটা কথা বলবার জন্যে
 phone করেছিলাম।"

"বন্ধন"

"বাংলা সুপ্রিম হবে" বলতে বলতে হাট পাঁচ কার
 মিজের সঙ্গে কল্পে উঠলেন তিনি।

পিবোত্রপুত্রের বাসন ছেড়ে নিয়োগের আগ্রস্তের মধ্যে
 চলে এলেন নারির পুর আফ্রা মেথালনে বন্ধনীর

পিরোজপুরে দ্বিতীয় খুনটি করল উত্তেজিত মানুষ। যাকে মারল তার একটিমাত্রই দোষ, সে অবাঙালি। অবাঙালিরা যে-নির্যাতন চালাচ্ছে তার খবর আসত হরদম। বাঙালির sentiment আশুন হয়ে জ্বলছিল। হতভাগ্য বিহারিটা সেই আশুনকেই প্রজ্বলিত করল শুধু।

পিরোজপুরে কিছু অবাঙালি পরিবার ছিল। তাদের নিরাপত্তার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো। এর উদ্যোক্তা হলেন আলী হায়দার খান আর আক্বা নিজে। পুলিশের মধ্যে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি কনস্টেবল ছিল, তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। O.C সাহেবের বাসায় তার নিরাপত্তার জন্যে আক্বা বিশেষভাবেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সিন্ধের SDO সাহেব তার অনেক আগেই আশঙ্কা আঁচ করে বরিশালের ADC-র বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। গভীর রাতে টেলিফোন এলো একবার। করেছেন বরিশালের SDO মহিবুল্লাহ্ শাহ্—

‘ভাল আছেন SDPO সাহেব?’

‘জি, আপনি ভালো?’

আছি আর কি। আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে phone করেছিলাম।

‘বলুন।’

‘বাংলা স্বাধীন হবে’ বলতে বলতে হাউ মাউ করে শিশুর মতই কেঁদে উঠলেন তিনি।

পিরোজপুরের বাসা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে এলাম নাজিরপুর। আক্বা সেখানেই রইলেন।

নাজিরপুরের বাসাতে ছিল একটা বাংলো বাড়ি। রসগিলালের
 মেকের অফিসারের কোয়ার্টার। চাকর পারিষদে আমের
 নী, চাষিদেরকে জেমন খোলামনে। বড় মড়ক হইবে হাটতে
 হি মে চাকর নাগলে। চাষিদেরকে সবুজি সবুজি একেবারে
 ছুটুলাল। দিন কাটতে গাঙ্গের বই পাড় আর তাম
 খেল। নিজেদের সুবিদার জন্মে তাদের তাম খেলা
 কিনিয়া নিশেখিলাল। পাড়ার হিন্দু কে ঘিরা বেড়াতে
 আসত। আসার সঙ্গে ডারি খাতির হল তাদের
 তাদের বাসায় আসাকে হইবে নিশে দেখ। হুজিব করা
 শুধু করে পাড় অথবা সবার বেনা। কামীর তখন
 emergency host period. যাঁই বুঝে দেব যদি করে
 হলে দেব। শুধু তাই নয় কেন জানিবা কাহো মাল
 করা বলেন না, হোথ হলেন কখন না। কি অসুখি
 তাও বলেন না মে জারি বিক্রি পারিসিতি; অসুখা
 তাকে নিশে কাঠ পাবলেন। দেড়ার এখন আরু
 পারিসিতিতে কামীর কামিরাটে আসাদের সবার খুব আকাশ
 লাগছিলে।

এদিকে জাঙ্গা জাঙ্গের একা একা। বাবা সবার
 জন্য আছে কামিরা। হাতে জাঙ্গাদের বাসাতেই থাকেন
 কোর্ট ইন্সপেক্টর। নাজিম তাইও থাকেন। জাঙ্গারই
 তাকসু। মেই আছেই এক আত্মনার কারখানা।

এদিকে নাজিরপুরে ০/৫ জাঙ্গাদের বেশ
 মঙ্গ করছিলো। সন্ধান বিজান খোঁজ নিলো হাতে
 দু জন দুনিয়া এসে পাশারা দিত। দুই পাশার
 নিজেই হাট থেকে। লোকটাকে একটুও ভালো লাগা
 না

নাজিরপুরের বাসাটা ছিল একটা বাংলা বাড়ি। হসপিটেলের মেডিকেল অফিসারের কোয়ার্টার। চমৎকার পরিবেশ সামনে নদী, চারিদিকেই ভীষণ খোলামেলা। বড়ো সড়ক ধরে হাঁটতে কি যে চমৎকার লাগত। চারিদিকে সবুজে সবুজে একেবারে সয়লাব। দিন কাটত গল্পের বই পড়ে আর তাস খেলে। নিজেদের সুবিধার জন্যে তাদের তাস খেলা শিখিয়ে নিয়েছিলাম। পাড়ার হিন্দু বৌ-ঝিরা বেড়াতে আসত। আমাদের সঙ্গে ভারি খাতির হলো, তাদের বাসায় আমাদের ধরে নিয়ে যেত। যুদ্ধের কথা শুধু মনে পড়ত খবর শোনার বেলা। মামির তখন Pregnancy first period. যা-ই মুখে দেন বমি করে ফেলে দেন। শুধু তাই নয় কেন জানি না কারো সঙ্গে কথা বলেন না, চোখ তুলে তাকান না। কি অসুস্থ তাও বলেন না। সে ভারি বিশ্রী পরিস্থিতি। আমরা তাকে নিয়ে সন্ত হয়ে পড়লেন। দেশের এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মামির হুমিকাটা আমাদের সবার খুব খারাপ লাগছিল।

এদিকে আক্বা আছেন একা একা। রান্না বান্নার জন্য আছে রশীদ। রাতে আমাদের বাসাতেই থাকেন কোর্ট ইন্সপেক্টর। নাজেম ভাইও থাকেন। আমাদেরই ব্যবস্থা। সেইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা।

এদিকে নাজিরপুরের o/c আমাদের বেশ যত্ন করছিল। সকাল-বিকাল খোঁজ নিত। রাতে দু-জন পুলিশ এসে পাহারা দিত। দুধ পাঠাত নিজের বাড়ি থেকে। লোকটাকে একটুও ভালো লাগত না।

দুই' চচহারা, লোহা ত্রাঙ্গা কাপড়, চিত্র বেড়াল জিঞ্জি
বেড়াল জাব। সব মিলিয়ে উল্লিখিত কাজে। তার সঙ্গে
সবচেয়ে দুর্গতির পুনে মজিরব এবং মজিরব একটা
কথা চোরা।

মজির পুর বাসায় একজন ত্রাঙ্গা আমলে।
প্রায় কোমর। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি কারিগরী
হাফিখি স্নায়ু মিলিয়ে তার ত্রাঙ্গা বিহীন।
নাড়ু সোপাল নাড়ু সোপাল চচহারা। একবার
আমলে তার নড়তে চাইলে না। মামীর বাড়ি
বঁচে খন্টার পর খন্টা বসে থাকত। কসীর
অন্যে উল্লিখিত বটেই পথ্য চর্চা পাঠালে।
নিজে মে জামাতে ইস্তাফার একমুঠে পাঠ।
তার প্রধান বাংলা দেশে মজির হস্তা মামেই
সবচেয়ে মুসলমানের বিহীন হস্তা। তার মুক্তি
ছিল শায়কর তার মুঠে "বাল্লীয়া স্বভাব আকুল
কাজেই বাল্লীয়া সোনার্মি করবে। বেশী
এক বাংলা মামে মে তাঁর আশ্রয়, টাইট
করতে মেলিটারী পাঠিয়েছেন ..." এই জামায়।

মাঠ হোক দিন মন্দ - কাটেছিলো না।
টেলিফোনে আশ্রয় মলে জানাপ হত। বিদেশীরা
বাংলা দেশে সবচেয়ে কে কি বলেছে স্তন্য চেষ্টা
শুঁটিয়ে শুঁটিয়ে।

মামে মামে মজিরপুর আসতেন।
একদিন থেকেই আবার চলে যেতেন। প্রায়ই তাঁর
মামে থাকত জালী হাঙ্গদর। আশ্রয় হলেই কে
বড় পছন্দ করতেন

ধূর্ত চেহারা, নোংরা জামা কাপড়, ভিজে বেড়াল ভিজে-বেড়াল ভাব। সব মিলিয়ে ভীষণ বাজে। তার মতে, সমস্ত দুর্গতির মূলে মুজিবুর এবং মুজিবুর একটা জন্মচোরা।

নাজিরপুর বাসায় একজন ডাক্তার আসত। গ্রাম্য কোয়াক। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, কবিরাজি হাকিমি সমস্ত মিলিয়ে তার ডাক্তারিবিদ্যা। নাড়ু গোপাল নাড়ু গোপাল চেহারা। একবার আসলে আর নড়তে চাইত না। মামির নাড়ি ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। রোগিনীর জন্যে ঔষধত বটেই পথ্য পর্যন্ত পাঠাত। নিজে সে জামাতে ইসলামের একনিষ্ঠ পাণ্ডা। তার ধারণা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া মানেই সমস্ত মুসলমানের হিন্দু হয়ে যাওয়া। তার যুক্তি ছিল হাস্যকর আর উদ্ভট 'বাঙালির স্বতন্ত্র' খারাপ কাজেই বাঙালিরা গোলামই করবে। বেশি 'জয় বাঙালি' বলেছে যে তাই আল্লাহ্ টাইট করতে মিলিটারি পাঠিয়েছেন এই জাতীয়।

যাই হোক দিন মরু কাটছিল না। টেলিফোনে আবার সঙ্গে আলাপ হতো। বিদেশীরা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কে কি বলেছে শুনতে চাইতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মাঝে মাঝে নাজিরপুর আসতেন। একদিন থেকেই আবার চলে যেতেন। প্রায়ই তার সঙ্গে থাকত আলী হায়দার। আঝা ছেলেটিকে বড়ো পছন্দ করতেন।

জন্মের কিছু সময় আমাদের সাথে থাকার কথা
 থাকলেও থাকতে পারতেন না। পিরুজপুরের
 এম. ডি. ও রাজারি সাহের তালমত বন্দে। SDPO
 সাহের আমাদের একা বেধে আপনি চলে গেলে
 আমরা কি করে থাকি?

একদিন বিকেলে খুব হুলস্থুলি মক
 স্তনা মেতে লাগলো। মন্থা হলে দেখা সেরা মুখে
 কোথাও নক নক করছে আস্তর। আকাশে গাঢ় রক্ত
 র্ণ। আর পেলান কানকোটি বাজার মেনিটোরী
 প্রতিবে দিচ্ছে। রাতে নাজিরপুরের ০.৫ এমে
 তখন দিতে চাইল আমাদের বন্দো "ও কিছুমু"
 ও কিছু নম, লাল মেয়ে আমরা মরাই কিছু ভয়
 পোনেছিলাম। এত কমে মেনিটোরী কখন পিরুজ
 পুরে আমে বেগানে। এতমে হুঁইনম পততে
 শুরু করলাম মরাই মিলে।

তার একদিন পরই নককাল আর
 আওয়ামী লীগের ডিটর ডিন প্রকোচ্যপী স্তনি
 বিনিময় হল পিরুজপুরে। অস্ত্রযানী
 লীগের সঙ্গে আছে, বেসুলার আমি, একু
 আমি, পুনিম, আমসার আর কিছু
 নেভাল অফিসার। নককালরাই কিছু জিতলো

আব্বার কিছু সময় আমাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে থাকলেও থাকতে পারতেন না। পিরোজপুরের এস.ডি.ও রাজ্জাক সাহেব তাহলেই বলতেন, SDPO সাহেব আমাদের একা রেখে আপনি চলে গেলে আমরা কী করে থাকি?’

একদিন বিকেলে খুব গোলাগুলির শব্দ শোনা যেতে লাগল। সন্ধ্যা হতেই দেখা গেল দূরে কোথায় লক লক করছে আগুন। আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ। খবর পেলাম ঝালকাঠি বাজার মিলিটারিরা পুড়িয়ে দিয়েছে। রাতে নাজিরপুরের o/c এসে অভয় দিতে চাইল আমাদের। বলল, ‘ও কিছু নয় ও কিছু নয়, লাল মেঘ।’ আমরা সবাই কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম। এত কাছে মিলিটারি বাহিনী পিরোজপুরে আসে কে জানে। খতমে ইউনুস পড়তে শুরু করলাম সবাই মিলে।

তার একদিন পরই নকশাল আর আওয়ামী লীগের ভিতর তিনঘণ্টাব্যাপী গুলি বিনিময় হলো পিরোজপুরে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আছে, রেগুলার আর্মি, এক্স আর্মি, পুলিশ, আনসার আর কিছু নেভাল অফিসার। নকশালরাই কিন্তু জিতল

৫৮

অশ্রুত ওরা দলে গাভ্র কুড়ি পঁচিগাজন। বন্দুক হাতে
তাঁরা সমস্ত কাছরে আধিপত্য বিস্তার করে আওয়ামী
লীগদের সন্ত্রাসের বাঁহরে বেড় কর দিন। অশ্রুত
আওয়ামী লীগের হাতে তখন যেন গান, ব্রেটাগান,
টেলি সানের রত অস্ত্র। নকশালদের সম্মুখ নাঁহিটো
গ্নিসারীলের হাওঁ এক্সপ্লোমিভ কোমা আ গাশা নিজেই
ঠেঁরা কয়েছে তার স্টা পনকো ঝাঁহিয়েল।

ইকবাল সফায়েনা আন্সাকে টেলিফোন
করতে গেল। ফিরে এসে বললে আন্সকা ভীষণ
নাভীম হয়ে পাড়ছেন। বললে আন্সকা মেনে সকাল
বিকাল তার মনে জাল করি, সোমু কিয়ুও মেন
করে।

পরদিন সকালে আন্সকা টেলিফোন
করলেন।

‘কি রে বাধু এত করে বলি সকাল বিকাল
টেলিফোন করতে আর সেরা চুপচাপ।’

‘করবে আন্সকা সকাল বিকালই করবে।’

‘মন বড় খারাপ থাকে। একটা দিন শায় আর
গান শু্য আবেকটা দিন বাঁচলান। সেরা কথা
বললে তাও একটু ভাল নাহে।’

‘নকশাল-আওয়ামী সন্ত্রাস মিটেছে আন্সকা?’

‘হ্যাঁ উপরে উপরে মিটে নাহেই? মনি জাল আন্সকা?’

‘জি’

অথচ এরা দলে মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন। বন্দুক হাতে তারা সমস্ত শহরে আধিপত্য বিস্তার করে আওয়ামী লীগদের শহরের বাইরে বের করে দিলো। অথচ আওয়ামী লীগের হাতে তখন স্টেনগান, ব্রেটাগান, টমি গানের মতো অস্ত্র। নকশালদের সম্মল নাইট্রো গ্লিসারিনের হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা, যা তারা নিজেই তৈরি করেছে আর গোটা পনেরো রাইফেল।

ইকবাল সন্ধ্যাবেলা আঝাকে টেলিফোন করতে গেল। ফিরে এসে বলল আঝা ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বলেছেন আমরা যেন সকাল-বিকাল তার সঙ্গে আলাপ করি, শিখু-শিখুও যেন করে।

পরদিন সকালে আমি টেলিফোন ধরলাম।

‘কি রে বাচ্চু এত করে বলি সকাল-বিকাল টেলিফোন করতে আর তোরা চুপচাপ’

‘করব আঝা, সকাল-বিকালই করব।’

‘মন বড় খারাপ থাকে, একটা দিন যায় আর মনে হয় আরেকটা দিন বাঁচলাম। তোরা কথা বললে তাও একটু ভাল লাগে।’

‘নকশাল-আওয়ামী গুণ্ডগোল মিটেছে আঝা?’

‘হ্যাঁ উপরে উপরে মিটমাটই। মনি ভালো আছে?’

‘জি।’

‘জুং টুং লাসেস?’

‘না। টেলিফোন রাইজিং দিব?’

‘কি এত অজ্ঞানতা। বিদেশী অফিসে টেলিফোন বন্ধ...’

বরিশাল শহর টেলিফোনি দখল করে নিল
অন্য আমাদেব। জিন দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ
চাৰিদি, উপর থেকে বোমা বর্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধা
সৈন্যে দিল। চাৰিদিকে মহাশয় এতে জুং টুং
সংলেশ। আলি হামুদাব একদিন এসে আমাদেব
পরিষে নিল বাবনাথ। প্রকৃষ্টিবিশেষের আত্মীয়
এই পরিচায়ে সেই বরিশাল শহর বাড়া নিলে
হুলালেব আমাদেব প্রকৃত দোগলা বাড়া, বাড়ী
শানিক মোহাবক দিন প্রবীণ কয়ল লোক চিবি
পৰম সমাদরে আমাদেব প্রশংসা করলেব। চাৰিদি
থেকে লোক ভেলে পৰলো আমাদেব বদখতে।
‘আহা এই দুঃসময়ে কি কহেই না এরা
পাৰেছে।’ মহাশয় মুখে এই কথা। ‘কি বহু
‘পানুস এক কি দিবে এদের সমাদয় কৰি।’

কিছু বেন জানিনা এত মত এত সমাদর
পত্রেও আছি খুব দমে নিলেছিলাম। শহুরে জামুগাট
পাৰিবেশই মনেষ উপর কাজ করছিল। জামুগাট
কেনেব এমন দম বন্ধ করা। চাৰিদিকে এখন বন

‘ভয়-টয় লাগে?’

‘না। টেলিফোন রাইখা দিব?’

‘কি এত তাড়াতাড়ি। বিদেশি খবর টবর বল...’

বরিশাল শহর মিলিটারি দখল করে নিলো অল্প আয়াশে। তিন দিক থেকে সাড়াশি আক্রমণ চালিয়ে, উপর থেকে বোমা বর্ষণ করে মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দিলো। চারিদিকে সবাই এতে ভয় পেয়ে গেল। আলী হায়দার একদিন এসে আমাদের সরিয়ে নিলো বাবলায়। এক ব্যারিস্টারের আত্মীয় এই পরিচয়ে সেই ব্যারিস্টারের বাড়ি নিয়ে তুললেন আমাদের। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, বাড়ির মালিক মোবারক খান প্রবীণ বয়স্ক লোক, তিনিই পরম সমাদরে আমাদের গ্রহণ করলেন। চারিদিক থেকে স্নান ভেঙে পড়ল আমাদের দেখতে। ‘আহা এই দুঃসময়ে কিস্টেই না এরা পড়েছে।’ সবার মুখে এই কথা। ‘কি যত্নের মানুষ এরা কি দিয়ে এদের সমাদর করি।’

কিস্ত কেন জানি না এত যত্ন এত সমাদর সত্ত্বেও আমি খুব দমে গিয়েছিলাম। হয়ত জায়গাটির পরিবেশই মনের ওপর কাজ করছিল। জায়গাটা কেমন যেন দম বন্ধ করা। চারিদিকে ঘন বন

কখনে অধিক, একটুকুও খোলাখোলা নয়। কখন একটা
 দূর ব্রহ্মকণ্ড ছাড়া। দুনিয়ায় আমি ইংলিশ
 উঠলাম। আলী শাহাদার মেয়ে আমাদের বেথে
 পালিশেছে আর খোঁজ নেই। বলে গেছে unwell
 গুণগুণ্ড এ থাকতে হচ্ছে, তবে কাছ কাছিয়ে আছি।
 আমায় একেবারে একা পরে চললাম। প্রকার বন্দাবন
 হল ছই ডালো। মেয়েটা দুঃখময়। ছেলেটা
 নৌচের তলায়। বাহ্যে কোন পদা কাজেই আমরা
 আশ্রয় আর নোয়ু বিপুল মনে বিধিগ্ন হয়ে
 পরলাম। সূচীম দিনে আলী শাহাদার প্রায় একটা
 হাঙ্গি তামাভায় কো কাটলো দিনটা। বাহ্যে
 খেতে বসেছি কে এমের বন্দালো। খুব
 খারাপ খরব শিবিরে গুঁড়ি কবেছে
 নকশাল বা। আশ্রয় নীলের মনে খুব সুলভনি
 ইচ্ছাচ্ছ। কোমর বন্ধন হবেছে। বুক
 ভিতর স্বিক করে উঠলো। ডাও বিস্ময় হয়ে গেল।
 আলী শাহাদার যদিও বাহ্যে বন্দে ও কিছু নয়
 মর জামুগায়ু প্রেজারী মুটে হয়েছ তবুও তার মুখে
 আত্মে কালো হয়ে উঠলো। আলী শাহাদারকে
 জিজ্ঞাস করে জানলাম অসহ্য বাহ্যে আমাদের
 বর্ধমান খিননা জানেন না। এই মিন্দে -
 কোথায় বাহ্যে তিনি? দারুন দুঃখিত
 বাহ্যে কাটলো। পরদিন খুব সকালে ইকরাল
 আর ইকরাল এক পাটোলান নাহিরপুর। হামখান

জঙ্গলে আচ্ছন্ন, একটুকুও খোলামেলা নয়। কেমন একটা দমবন্ধ করা ভাব। দু-দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। আলী হায়দার সেই আমাদের রেখেই পালিয়েছে আর খোঁজ নেই। বলে গেছে under ground-এ থাকতে হচ্ছে, তবে কাছাকাছিই আছি। আমরা একেবারে একা পড়ে গেলাম। থাকার বন্দোবস্ত হলো দুই ভাগে। মেয়েরা দু-তলায়। ছেলেরা নিচের তলায়। বাড়িতে কঠিন পর্দা, কাজেই আমরা আন্মা আর শেফু শিখুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তৃতীয় দিনে আলী হায়দার আবার এল। হাসি তামাশায় বেশ কাটল দিনটা। রাতে খেতে বসেছি কে এসে যেন বলল, খুব খারাপ খবর, পিরোজপুরে ট্রেজারি লুট করেছে নকশালরা। আওয়ামী লীগের সঙ্গে খুব গোলাগুলি হয়েছে। বেশ কয়েকজন মরেছে। সরকারের ভিতর ধক করে উঠল। ভাত বিস্বাদ হয়ে গেল। আলী হায়দার যদিও বারবার বলছে ও কিছু নয়, সব জায়গায় ট্রেজারি লুট হয়েছে; তবুও তার মুখ আতঙ্কে কালো হয়ে উঠল। আলী হায়দারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আন্মা বাবলায়, আমাদের বর্তমান ঠিকানা জানেন না। এই বিপদে কোথায় যাবেন তিনি? দারুণ দুঃশ্চিন্তায় রাত কাটল। পরদিন খুব সকালেই ইকবাল আর ইউনুসকে পাঠলাম নাজিরপুর। সেখান

থেকে টেলিফোনে আবার মাল্লে জানাপ করবে।
 আমি আর বৃন্দাম মামা চললাম পিরোজপুর।
 প্রায় আট মাইল রাস্তা। সামসিক উৎকর্ষ
 খুব দ্রুত হাতিয়ে হাটখিলাম দু জন। কোন
 বকমে পিরোজপুরে পৌঁছতে পারলে বাঁচি।
 রাস্তায় অনেক পরিবারের মনে দেখা হল তারা
 সবাই বাহর ছেড়ি গানে এসে পড়াচ্ছে অনেকই
 আমাদের বাহরে হতে জানা করলে। এরা সবাই
 নরকান দেব উপর বিশ্বাস রাখা বলছে এরা
 নরকান নর টোকাল।" বাহরের উপর
 আমতই দেখা হল কনাকর বন্দুকধারী লোকের
 মাল্লে। তারা আমাদের সঙ্গে থেকে যথাক্রমে দাঁড়ান।
 আমার দিকে তাকিয়ে কখন কখন -

"আপনি SDPO বাহরের দেনে?"

"হ্যাঁ।"

"চেয়ারম্যান অসুস্থ মিল। কুখর দেখায়ে গিয়েছি।
 কোথায় যাচ্ছেন?"

"আবার খোঁজে পিরোজপুর।"

"আরে তাঁর সঙ্গে কান হাতে দেখা হচ্ছে,
 আমার। তিনিই আমাদের খোঁজে রেখেছেন।
 পাসলের মত। চিকান কামে নাহে।
 আপনি বরুণচ নাঙ্গিরপুর যান। বাহরে চিঠি
 মরুবের নাকি?"

থেকে টেলিফোনে আবার সঙ্গে আলাপ করবে। আমি আর রহুল মামা চললাম পিরোজপুর। প্রায় আট মাইল রাস্তা। মানসিক উৎকণ্ঠায় খুব দ্রুত গতিতেই হাঁটছিলাম দু-জন। কোনোরকমে পিরোজপুরে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। রাস্তায় অনেক পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো তারা সবই শহর ছেড়ে গ্রামে এসে পড়ছে। অনেকেই আমাদের শহরে যেতে মানা করল। এরা সবাই নকশালদের ওপর বিষম ক্ষ্যাপা বলছে, 'এরা নকশাল নয় টাকশাল।' শহরের উপকণ্ঠে আসতেই দেখা হলো জনাকয় বন্দুকধারী লোকের সঙ্গে। তারা আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে একজন বলল—

'আপনি SDPO সাহেবের ছেলে?'

'জি।'

'চেহারা অদ্ভুত মিল। মনে পড়েছেই চিনেছি। কোথায় যাচ্ছেন?'

'আবার খোঁজে পিরোজপুর।'

'আরে তাঁর সঙ্গে কাল রাতে দেখা হয়েছে আমার। তিনি তো আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাগলের মতো। ঠিকানা জানেন না তো।'

'আপনি বরংচ নাজিরপুর যান। শহরে গিয়ে মরবেন নাকি?'

শিবে চুলনাম, মনে দারুন উৎসাহ। কি বুঝাকিল
জান্নী হামদার কচিকানাটো চর্চিত বানায়নি। এখন
কি উপায়। খামতে খামতে, পারিশ্রমে অধিকার
হয়ে চৌদ্দনাম। ~~অন্য~~। স্তননাম ইকবাল এসেছে
খবর এনেছে আকা রওনা হলেছেন কিছুক্ষণের
ধর্মী হলে এসে পাবেন।

আম্মা আমলের মস্তানাসাত! মে
ছবিটা খুব স্মৃষ্টি মনে আছে। খোঁচা খোঁচা
দাড়ি গোঁফ, উদপ্রান্ত চুর্চি, পাগলের মত চাউনি,
সুখ্য শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত এবং
অবমন পায়ের গিনি উঠে আমলের। মল্ল নারিক
ভাই আর ছুন্ ঝুন্ক জোমান। আম্মা
বিছনায় বসে হাঁপাতে আমলে। গল গল করে
খাম সড়িয়ে তার কদাল হইয়ে। গ্রন
খন জীব রেড় করে হাঁটে ডিকাদেয়ন। কাছে
বসে মোরারক খান অসখ্য আমলে প্রম
কর আম্মাকে বিরক্ত করতে লাগলো। গিনি ক্লান্ত
গলায় প্রতিদিন জবাব দিতে লাগলেন। আম্মা
একটা পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া দ্বারা দ্বিত লাগলেন।
তক্ষণ তাঁকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে আম্মাকে
মলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মনটা
অনেক হালকা।

ফিরে চললাম, মনে দারুণ উদ্বেগ। কি মুশকিল আলী হায়দার ঠিকানাটা পর্যন্ত জানায়নি। এখন কি উপায়। ঘামতে ঘামতে পরিশ্রমে আধমরা হয়ে পৌছলাম। শুনলাম ইকবাল এসেছে, খবর এনেছে আক্বা রওনা হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এসে পড়বেন।

আক্বা আসলেন সন্ধ্যা নাগাদ। সে ছবিটা খুব স্পষ্ট মনে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলের মতো চাউনি, মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত আর অবসন্ন পায়ে তিনি উঠে আসলেন। সঙ্গে নাজিম ভাই আর দু-জন বন্দুকধারী জোয়ান। আক্বা বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগলেন। গল গল করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তার কপাল বেয়ে। ঘন ঘন জিব ঝর ঝর করে ঠোঁট ভিজাচ্ছেন। কাছে বসে মোবারক খান অসংখ্য প্রশ্ন করে আক্বাকে বিরক্ত করতে লাগল। তিনি ক্লান্ত গলায় প্রতিটির জবাব দিতে লাগলেন। আন্মা একটা পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন। আমি তাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যেই মামাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চলে গেলাম। মনটা অনেক হালকা।

লেখকের লেখা ৬৩ পৃষ্ঠা

AMARBOI.COM

এখানে পৃষ্ঠা নম্বরের ধারাবাহিক পাতা নেই, তবে মনে হয় পৃষ্ঠা হারিয়ে
যায়নি; পৃষ্ঠা নম্বর দিতে ভুল হয়েছে।

AMARBOI.COM

ট্রেডারী লুট সম্বন্ধে আস্থা বিশেষ কিছু বলছেন না। তিনি
 কেমন মেনে বিক্রান্ত হয়ে চিয়েছিলেন। যা বলছেন তার
 থেকে এষ্টটুকু বুঝা যাচ্ছিল যে দুজন নকশাবান
 শেখরবার সকালে ষ্টাফ দুই ঘেঁসে সান হাতে এম.টি.৩
 আর ট্রেডারী অফিসার এর ঘরে ঢুকে পরে তারপর
 বলে ট্রেডারী খুলে দাও নম্বলো পর স্থলি খেলে।
 সকাল ৯ টায় দিলে দুপুরে ৯ টায় টাকার
 নিয়ে যায় তারা আত্মকে একদিন নকশাবান ঘিরে
 রাখে। আওয়ামী লীগ টাকারো নিজেদের কাছে
 রাখতে চিয়ে বাধা দেয় তার প্রচুর স্থলি কর্ম
 হয়। আচারতলা শত্রুদের অন্তর আমায়
 তালুত ইসলাম মেদিনান দিয়া খাটোখাট
 স্থলি কর্ম করে স্থলে নকশাবানদের ঠিকার। তিনি
 উন নকশাবান প্রায় পরে গেল।

আর মাঝাটো দিন ধুনিয়ে কাটানেন।
 কিছু তার বুক হাত বুলিয়ে দিল। নাম্বারের
 সমস্যাগুলিতে যত্ন চাষিতের মত উঠে খুঁজি নাম্বার
 পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কি হবে
 নম্বার? নম্বার পড়লি না। স্কী মেলা ষ্টাফ
 বাদকা গেলো। হাতে মস্ত এক বাস্তব। আমাদের
 আর ছু হাঙ্গদারের মোরে এমেছে। মে

ট্রেজারি লুট সম্বন্ধে আব্বা বিশেষ কিছু বললেন না। তিনি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যা বললেন তার থেকে এইটুকু বুঝা যাচ্ছিল যে, দু-জন নকশাল রোববার সকালে হঠাৎ দুটি স্টেনগান হাতে এস.ডি.ও আর ট্রেজারি অফিসারের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর বলে ট্রেজারি খুলে দাও, নয়তো মর গুলি খেয়ে। সকাল ৯টায় দিনে দুপুরে ৯ ট্রান্স টাকা নিয়ে যায় তারা, আব্বাকে একদল নকশাল ঘিরে রাখে। আওয়ামী লীগ টাকাটা নিজেদের কাছে রাখতে গিয়ে বাধা দেয়, তাতে প্রচুর গুলি বর্ষণ হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি তাজুল ইসলাম মেশিনগান দিয়ে খটাখট গুলিবর্ষণ করে চলে নকশালদের ওপর। তিনজন নকশাল মারা পড়ে এতে।

আব্বা সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটালেন। শিখু তার বুক হাত বুলিয়ে দিলো। নামাজের সময়গুলোতে যন্ত্র চালিতের মতো উঠে শুধু নামাজ পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিরে নমাজ? নমাজ পড়লি না। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ বাদশা এল। হাতে মস্ত এক রামদা। আমাদের আর হায়দারের খোঁজে এসেছে। সে

২৭ বললো জ শুনে আমকা মুক্তিভা মে বললো
 প্রম. ডি. ৫ আর ট্রেকারী অফিসার কে
 আওয়াজে লীচাব মুক্তি বাছনি হেঁকচার করে
 আটকে রেখেছে তাদের গোরিল্লা ট্রেনিং ক্যাম্প।
 সেখানে তাদের কিছুই খেতে দেয়া হয়না,
 কারো মলে কথা বলতে দেয়া হয়না। বাদনা
 খাব পেমেন্ট তাদের উদ্ধার করে নিজের
 বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। আত্মী সৃষ্টির নিঃশ্বাস
 ফেল বললেন থাক তবু দুইজন বেঁচে
 আছে আর ডয় নাই। অট ৯টার দিকে
 এলা আলী শাহুদার। আত্মী খুব খুশি হলেন।
 বললেন শাহুদার সাহেব ট্রেকারী মুক্তের
 পিছনে অনেককাল কাতলা আহছে যদি বেঁচে
 থাকি তবে একদিন নিশ্চয় বলবো।

বয়স আমাকে নিশ্চয় পঞ্চদশ চলে
 সেলাম আওয়াজ কার্টের বাবাবে। দুইজনটা
 নিমিত্ত কিনতে। সেখানেই শুভলাল পিকাপপুই
 মেলিটোরি এমেছে। মলারহাটে ৬৮নকে
 স্থলি করে রেখেছে নেমেই।

খবর শুনে আবার কোন ডাকসুর
 হিলনা। আবার চুপচাপ হয়ে গেলেন।
 মোরারক খান প্রচুর সব সবই আত্মাকে।

যা বলল তা শুনে আমরা স্তম্ভিত। সে বলল এস.ডি.ও আর ট্রেজারি অফিসারকে আওয়ামী লীগের মুক্তিবাহিনী গ্রেফতার করে আটকে রেখেছে তাদের গেরিলা ট্রেনিংক্যাম্পে। সেখানে তাদের কিছুই খেতে দেওয়া হয় না, কারো সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় না। বাদশা খবর পেয়ে তাদের উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। আব্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, যাক তারা দুইজন বেঁচে আছে আর ভয় নাই। রাত ৯টার দিকে এল আলী হায়দার। আব্বা খুব খুশি হলেন। বললেন, হায়দার সাহেব ট্রেজারি লুটের পিছনে অনেক বুই-কাতলা আছে, যদি বেঁচে থাকি তবে একদিন নিশ্চয়ই বলব।

রহুল মামাকে নিয়ে পরদিন চলে শেলাম শ্রীরাম কাটির বাজারে। দু-একটা জিনিস কিনতে। সেখানেই শুনলাম পিরোজপুরে মিলিটারি এসেছে। হুলারহাটে ৬ জনকে গুলি করে মেরেছে নেমেই।

খবর শুনে আব্বার কোনো ভাবান্তর হলো না। আরো চুপচাপ হয়ে গেলেন। মোবারক খান* প্রচুর যত্ন করেছে আব্বাকে।

* বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ মারা যাবার পর মোবারক খান বাড়ি থেকে পুরো পরিবারকে বের করে দিয়েছিল।

এটা খাওয়াচ্ছে, নিউটা খাওয়াচ্ছে। সুখে একবুনি
এত বড় অকিন্দার আমার ধবে কি দিয়ে বড় করি।

পঞ্চদশ জের ৯টোম একটা ছেলে এসে হাফি
নারিকেলপুত্রে ৩.৫ ব একটা চিঠি হাতে। চিঠি আর্জি
প্রথম পত্রনাট্য চর্যকার চিঠি অনেকটাই ঐই ছিলেব।

"... হোক, আমাদের ত আমরা ছাড়া কোন ভরসা নাই
আপনি আমার মন নিয়ে পিরোজপুরে যান।
এ ছাড়া এই বিদেশ বিহীন আমরা কি করতে পারি?
পূর্বে পিরোজপুরে ছেলে পত্রিকার পিরোজপুরে
০৫ জন্মায় টেলিকোম কানিয়েছেন কোন ও
নাই। তা ছাড়া পুনরায় পত্রিকা সব পুনিক
অকিন্দারদের বেলো বাবোম আবেগ হাফি
হলে বলছেন।

নাহোঁর আসে জন্ম করতে হলে মনস্ক নেষ্ট।
অত্যা আমারে ছুলেন। আফা চিঠি পাত্রে
আব দিগ্রেম কখন কিবে আব পিরোজপুরে?
মহাৎকেই এক প্রশ্ন। আমরা মবাই বনি কোন
ভয় নাই যান। মেলিটোরী ওতরিনমর্টেশন চালু
করতে চাইছে কাউকে কিছু বলবে নথ। আফা
নিসেও বন্ধন চিঠিকিউত কে পানাব? আব পানাল
দেলে পেলে নহ কানিই ইরিমে দেবে। আফা
আমা আব আনংগায় ছুলতে টমকে হেও করলেন।
চিড়া পেলেন। কানি পত্রনাট্য লোকা টিক হা।
আফার সুখ দেখে মনে হয় মাংস মাংস
আমাকে মাংস দেবার মত ইরমাব চন্দন মত

এটা খাওয়াচ্ছে, সেটা খাওয়াচ্ছে। মুখে এক বুলি ‘এত বড় অফিসার আমার ঘরে কি দিয়ে যত্ন করি।’

পরদিন ভোর ৯টায় একটা ছেলে এসে হাজির নাজিরপুরের o.c -র একটা চিঠি হাতে। চিঠি আমিই প্রথম পড়লাম, চমৎকার চিঠি। অনেকটা এই ধরনের :

‘... স্যার, আমাদের তো আল্লা ছাড়া কোনো ভরসা নাই আপনি আল্লার নাম নিয়েই পিরোজপুরে যান। এ-ছাড়া এই বিদেশ বিভূইয়ে আমরা কী করতে পারি? পিরোজপুরের o.c আমায় টেলিফোনে জানিয়েছেন কোনো ভয় নাই। তা ছাড়া খুলনারেঞ্জের DIG সব পুলিশ অফিসারদের বেলা বারোটার আগে হাজির হতে বলেছেন।’

বারোটার আগে জয়েন করতে হলে সময় নেই। আমরা আব্বাকে ডেকে তুললেন। আব্বা চিঠি পড়লেন আর জিজ্ঞেস করেন, কিরে যাব পিরোজপুরে? সবাইকেই এক প্রশ্ন। আমরা সবাই বলি, কোনো ভয় নাই যান। মিলিটারি এডমিনস্ট্রেশন চালু করতে চাইছে কাউকে কিছু বলবে না। আব্বা নিজেও বলেন ঠিকিইতো, কই পালাব? আজ পালালে ছেলেপেলেসহ কালই ধরিয়ে দেবে। আব্বা আশা আর আশঙ্কায় দুলতে দুলতে সেভ করলেন। চিড়া খেলেন। কাপড় পরলেন। নৌকা ঠিক হলো। আব্বার মুখ দেখে মনে হলো সাহস পাচ্ছেন। আব্বাকে সাহস দেবার জন্যে ইকবাল চলল সঙ্গে।

একাত্তর এবং আমার বাবা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

যখন আমি আর আক্বা নৌকা করে রওনা দিই তখন আর সবাই নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে চূপচাপ রওনা দেওয়াটা আমার খারাপ লাগল। আমি ভাবলাম যাওয়ার সময় একটা কিছু আলাপ করে আবহাওয়াটা সহজ করি। শেফুকে জিজ্ঞাসা করলাম— ‘আজ কয় তারিখ, পাঁচ না?’

‘হ্যাঁ— পাঁচ।’

‘লাকি ডেট, তাই না?’

আমি জানতাম পাঁচ তারিখ নিউমোরলজি অনুযায়ী আমাদের জন্যে লাকি ডেট তবু সবার সামনে কথাটা বলে আতঙ্ক দুর্ভাবনা কমাতে চাইলাম। নৌকায় রওনা দিলাম। নৌকাটা ছিল ভাঙা— পানি উঠছিল সাংঘাতিক, একটু পরে পরে আমি পানি স্বেঁচছিলাম। বহুক্ষণ নৌকায় যেতে যেতে আক্বা একটাও কথা বলেন নি। একবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেকেন্ড আর ফোর্থ অফিসার কোনো গ্রামে আছে আমি জানি কি না? আমি গ্রামের নাম বললাম। আক্বা হিন্দু মাঝিটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পথে পড়বে নাকি? মাঝি জানাল যে পড়বে না। আমার সঙ্গে আক্বার আর কোনো কথা হয়নি— পথে শুধু এক চেয়ারম্যান আক্বার সঙ্গে খানিক আলাপ করেছিল। চেয়ারম্যান তখন খুব ব্যস্ত, চারদিক ভয়ানক লুটপাট। আক্বা তাকে বললেন— ‘আপনারা এটা বন্ধ করেন বাকিটুকু আমরা ঠিক করব।’ তখন চেয়ারম্যান আরও খানিকক্ষণ আলাপ করল, নৌকা থামেনি, কাজেই আলাপ বেশিক্ষণ চলতে পারে নি। পথে আরেকজন লোকের সঙ্গে দেখা। শক্তসমর্থ শরীর, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। আক্বাকে দেখে ভারি অবাক হলো, ‘স্যার? আপনি যাচ্ছেন?’

আক্বা হাসলেন, বললেন, ‘দেখে আসি।’ লোকটার বিশ্বাস হয় না, জিজ্ঞাসা করল, ‘সত্যি যাচ্ছেন? সাহস পান?’

আমার চাকরিটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মাসে মাসে
নামসে - খিঁচিয়ে আসলেও তাও তখনই আশ্রয়
আমার মাসে মিস্টারের কাছে - খিঁচিয়েও
কেনো এটা খেলেও হয় ও তাই লেখা হয়
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমার মাসে মাসে আসলেও মাসে মাসে
তখন খিঁচিয়ে আসলেও তাও তখনই আশ্রয়
আমার মাসে মিস্টারের কাছে - খিঁচিয়েও
কেনো এটা খেলেও হয় ও তাই লেখা হয়
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

এ. এ. সি. ও
স্বদেশ বাসনে আমায় চোখ দিয়ে
ও হাত - দিয়ে।

আলাপ চালানোর জন্যে সে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল, মিলিটারি সম্পর্কে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানাল। আমরা যাচ্ছি মিলিটারির কাছে, তাই তার সব কথা বিশ্বাস করলাম না।

আমাদের নৌকা যখন কালীগঙ্গা নদীতে পড়ল তখন চারিদিকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও আমি আর একটাও নৌকা দেখলাম না। ছলারহাট ডকটা একেবারে নির্জন। আমার কেমন খারাপ লাগল— একটু ভয় ভয়ও। নদী দিয়ে একটা সাদা লঞ্চ আসছিল— ওপরে পাকিস্তানি পতাকা। দেড়মাস পরে আবার আমি ভাবলাম গানবোটই নাকি কে জানে। নৌকা ছলারহাটে পৌঁছালে আমরা উপরে উঠে দেখি রশিদ মাথায় একটা টুপি চাপিয়ে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ যে ভয় ভয় লাগছিল রশিদকে দেখে সেটা একটু দূর হলো। রশিদ চেপে রওনা দিলাম। রশিদ মাঝে সাইকেল চালাতে চালাতে মিলিটারির গল্প করছিল। তার মুখ থেকে শুনলাম সেকেন্ড অফিসার আর ফিল্ড অফিসার সকালেই এসে গেছেন। পিরোজপুরে পৌঁছে মিলিটারির পজিশন নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে, ফাঁকা আওয়াজ করেছে, কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়েছে অর্থাৎ রীতিমত যুদ্ধাভিযান। আমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

‘এস.ডি.পি.ও কাঁহা?’

রশিদ জানাল, সে বলল, গ্রামে টুয়ে গিয়েছেন।

মিলিটারি বলেছে, ‘ও ভাগ গিয়া!’

রশিদের মতে মিলিটারিরা টাউনে কোনো অত্যাচার করে নি— মেজর সাহেব নাকি খুব ভাল মানুষ! শুধু কয়েকজন হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। বাসায় পৌঁছে দেখি প্রকাণ্ড একটা পাকিস্তানি পতাকা শোভা পাচ্ছে। শুধু বাসায় না যেদিকে তাকানো যায় শুধু পাকিস্তানের পতাকা, বাসায়, দোকানে, রিকশায় এমনকি মানুষের পকেটে!

বাসায় ড্রয়িংরুম ফাঁকা, আসবাবপত্র শোয়ারঘরে গাদা করা। দুটো পালঙ্ক জড়ো করে জোড়াবিছানা, সবমিলিয়ে এক শ্রীহীন অবস্থা। আক্বা ও.সি.কে ফোন করে জানতে চাইলেন এখন কি করা। ও.সি অডয় দিয়ে অফিসে চলে আসতে বললেন। আক্বা পোশাক পরলেন রশিদ সাহায্য করল। আক্বার ডান হাতের বোতাম খানিকটা কি ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিভাবে সেটা কাউকে বলেন নি, রশিদ সেটা অগ্নানেজ করে দিলো। আক্বা একটা ডাইরি নিয়ে অফিসে গেলেন।

বাসায় চারিদিক থেকে ধূয়া উঠছে— দুমদাম শব্দে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙা হচ্ছে— সে এক বিশ্রী ব্যাপার। আমি খানিকক্ষণ হরিণটাকে আদর করলাম। গোসল করে Wodehouse-এর একটা বই বের করলাম। রশিদ চা তৈরি করে দিলো, তার লুট করে আনা সম্পত্তি দেখাল। তখনই আমি প্রথম জানতে পারলাম মিলিটারিরা লুট করাচ্ছে। এখন আর লুট করা অপরাধ নয়, আইনগতভাবেও নয় নৈতিকভাবেও নয়। আমার মনটাই তেতো হয়ে গেল।

ভাত রাঁধা হলো, তরকারী কুখাদ্য— কৃমির মতো লম্বা লম্বা আতপ চাউল। আমি একলাই খেয়ে ফেললাম, আক্বা কখন আসেন ঠিক নেই। কিন্তু আক্বা আসলেন একটু পরেই। ইজিচেয়ারে বসলেন, মুখটা ভারি চিন্তাক্রিষ্ট। কথা না বলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ডাক্তার সাহেব আসলেন, তার মুখও কেমন বিবর্ণ উদ্ভ্রান্ত-উদ্ভ্রান্ত। ডাক্তার সাহেব আরেক কথা বললেন, মিলিটারি এসেই দু-জনকে মেরেছে, দুজনকে গুলি করেছে দৌড় দেওয়ার অপরাধে ইত্যাদি ইত্যাদি। আক্বা কোনো আলাপে বেশি উৎসাহ দেখালেন না, বার বার জিজ্ঞেস করলেন সেকেন্ড আর ফোর্থ অফিসার কই, কী ব্যাপার?

ডাক্তার সাহেব জানালেন তারা দু-জন এসেছে খুব সকালে, সারা গায়ে কাদামাখা পাগলের মতো চেহারা। প্রথমে দেখা করেছেন আফজাল সাহেবের বাড়িতে, তিনি পাঠিয়েছেন হাসপাতালে। হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব তাদের পোশাক বদলে দিলেন বাসায় এনে খেতে দিলেন দুধ, তারা খেতে চাইল না। তারপর দিলেন চা। চা খেলেন, কিন্তু দু-জনের কেউই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। একটু পরে কয়েকজন মিলিটারি আসল তাদের খোঁজে। ডাক্তার সাহেব জানালেন, তারা অসুস্থ। মিলিটারিরা

১৯৫০ - বিদ্রোহ শেষ হবার পরে - অত্যাচারী শত্রু/ভাষ্যক
বিদ্রোহ শেষ হবার পরে - অত্যাচারী শত্রু/ভাষ্যক

১৯৫১ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫২ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৩ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৪ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৫ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৬ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৭ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৮ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৫৯ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

১৯৬০ - ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন ২য় অধিবেশন

ANARBOI.COM

বলল, রিকশায় বসতে পারবে তো, তাহলেই হবে। তারপর রিকশায় বসিয়ে তাদের নিয়ে গেল।

রশিদকে আঝা একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, ‘রশিদ, সেকেন্ড অফিসার আর ফোর্থ অফিসার কই?’

‘কেন স্যার? তারা তো তাদের বাসাতেই আছে। সেকেন্ড অফিসারের বাসাতেই মিলিটারিরা আশ্রয় নিয়েছে, কাজেই সেখানে গিয়ে সন্দেহ মিটানো সম্ভব ছিল না। আঝা বারবার জানতে চাইছিলেন, তারা কি অ্যারেস্ট হয়েছে নাকি বাসাতেই আছে। কিন্তু কেউই এর সঠিক উত্তর বলতে পারল না, মিলিটারির এখন পর্যন্ত খারাপ রিপোর্ট নেই। আমরা ধরে নিলাম তারা বাসাতে ভালোই আছে। সেকেন্ড অফিসার আর ফোর্থ অফিসার সম্পর্কে আঝার কৌতূহল। ওদের সম্পর্কে আমার জিজ্ঞের কৌতূহল ছিল না, তাই ও ব্যাপারে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই নি।

আঝা গোসল করলেন, নামাজ পড়লেন, সেই অখাদ্য খাবার খেলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে বললেন, ‘বাবা আমায় চারটার সময় ডেকে দিবি। মিটিংয়ে যেতে হবে।’

আমি বললাম, ‘ঠিক আছে।’

বারটার সময় আঝাকে ডাকতে গিয়ে দেখি আঝা মোটেই ঘুমাননি- বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছেন মাত্র। সারা দুপুর আঝার মুখ চিন্তায় যে-রকম ভারাক্রান্ত হয়েছিল

এখন তা আর নেই, বরং সমস্যা মিটে গেলে যে-রকম প্রফুল্লতা ফিরে আসে সেরকম প্রফুল্ল। আঝা নিজেই উঠলেন— নামাজ পড়লেন, তারপর পোশাক পরে নিলেন, আমি বোতাম লাগিয়ে ভাঁজ ঠিক করে আঝাকে সাহায্য করলাম। আঝা যাবার সময় বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে আমাকে বললেন, ‘বাবা, আমার জন্যে দোয়া করিস।’

ডাক্তার সাহেবও মিটিংয়ে যাবেন, আঝা যাবার সময় তাকেও ডেকে নিলেন।

আমার কোনো কাজ নেই। রশিদ কার ঘর লুট করে পুরো এক ড্রাম চাল এনেছে। আমাকে মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল সেধেছে, তালা, তাস, পুরানো রয়াদ, লুটকৃত কিছু বাকি রাখে নি। বারান্দায় বসে দেখলাম, হাসপাতাল থেকে গুলি খেয়ে মৃত এক রোগির লাশ রিকশায় সরানো হলো।

আমি বিকেলে বাসার সামনে এসে বসলাম। ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে, বাবু আফরিন ওরা এতদিন পরে আমাকে দেখে ছুটে এল, আমার সঙ্গে তাদের হাজারো রকম ছেলেমানুষি গল্প।

একটু পরে দেখলাম কুলির মাথায় করে ‘এক লাখ’ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রেজারি লুটের টাকা! কোথেকে জানি জোগাড় করা হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পর

দেখলাম রিকশা করে মিলিটারি আসছে। তারা নকশালদের ধরে আনছে। ফজলুর হাত পিছমোড়া করে বাঁধা— আড়ষ্টভাবে বসে আছে— খালি গা। মুখের ভাব উদ্ধত। আরও কয়জন ছেলে, একজনের চোখ বাঁধা। সবাইকে চিনি না। খবর নিয়ে জানলাম কোনো বাড়িতে লুকিয়ে ছিল গ্রামবাসীরা ধরে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে এক গ্লাস দুধ পাঠালেন খালাম্মা। আমার গিয়ে দেখা করা উচিত কিনা ঠিক করতে পারলাম না। সন্ধ্যার দিকে কোর্ট ইন্সপেক্টর সাহেব রশিদকে দিয়ে তার বিছানা নিয়ে গেলেন।

বেশ আঁধার হয়ে এসেছে তখন। রশিদ এসে বলল, আফজল সাহেবের বাসায় যে মুন্শি থাকে, সে বলেছে সেকেন্ড আর ফোর্থ অফিসারকে নাকি গুলি করে মেরে ফেলেছে।

ধ্বক করে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল। এই প্রথম আমার আব্বার জন্য চিন্তা হলো। আব্বা এখনো আসেন নি।

দৌড়ে গেলাম ডাক্তার সাহেবের বাসায়। ডাক্তার সাহেব হতচেতনের মতো বেধে শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'চাচা ওরা সেকেন্ড আর ফোর্থ অফিসারকে নাকি গুলি করে মেরেছে?'

‘আমিও এ-রকম কথা শুনে এসেছি, এসেই শুয়ে পড়েছি।’

‘আব্বা— তাহলে আব্বা—’

‘তোমার আব্বা এখনো আসেননি?’

তারপর রশিদকে পাঠালেন থানায় খবর আনতে। আমি খবরাখবর নিলাম। মিটিংয়ে কে কে ছিল, কে কী বলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। রশিদ খবর আনল সবাই চলে এসেছে। আবার যাবে একটু পরে। আব্বা কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করছেন এখনো আসেন নি। খালাম্মা তাদের বাসায় থাকতে বললেন, আমি বললাম, ‘না-না, আব্বা আছেন তো, আমার ভয় করবে না—’

কারফিউর সময় হয়ে আসছে আমি বাসায় চলে এলাম। যতই সময় পার হতে লাগল, ততই দুশিঙ্কায় আমার হতে পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। আমি প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম এই বুঝি দরজায় ধাক্কা শব্দ, আর খুলেই দেখব আব্বা দাঁড়িয়ে আছেন! আস্তে আস্তে আটটা বাজল, এখনো আব্বার দেখা নেই। আমি মনকে প্রবোধ দিলাম, আব্বার কিছু হয় নি, আব্বা ভাল আছেন। কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করছেন। হঠাৎ কর্কশ স্বরে এক বাঁক গুলির তীব্র আওয়াজ হলো, খুব কাছে। সাথে সাথে আঁ-আঁ-আঁ করে কে যেন চঁচিয়ে উঠল। আমি শিউরে

উঠে পর মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, মানুষের চীৎকার নয় কাক। আমার সারা শরীর শীতল হয়ে উঠল। আশে পাশে এখানে সেখানে গুলির আওয়াজ, প্রতিটা গুলির শব্দ আমার স্নায়ুকে ভয়ানক আঘাত দিয়ে দিয়ে একেবারে দুর্বল করে তুলল। আমি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া, দোয়া ইউনুস পড়তে চাইলাম, মনে পড়তে চাইল না, মুখে আটকে যেতে লাগল।

মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম আঝা কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করছেন। আসবেন আরেকটুকু পরে। অশুভ চিন্তা মনে আসতে চাইলেই আমি সেটাকে জোর করে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। এইভাবে যদি কয়েকজনকে গুলি করে মারতে চায় তাহলে এলোপাথাড়ি আওয়াজ হবে না, আওয়াজ করতে হবে সুনির্দিষ্ট। একটু পরে পরে। দশটার দিকে আটটা গুলির আওয়াজ শুনেলাম,

সুনির্দিষ্ট শব্দ, একটার পর একটা— আমার মনে হলো আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

আমার চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, ভাববার সময় নেই, শুধু প্রার্থনা করছি— ‘আল্লাহ বাঁচাও— তুমি প্রাণ ভিক্ষা দাও...’

রশিদ আর ইসমাইল বারবার আমাকে ভাত খেয়ে নিতে বলল— ভাবখানা আমাকে এখন ভাত খাওয়াতে পারলেই একটা মস্তকিছু কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে!

আমি থানায় ফোন করি নি, ভয় লাগছিল— যদি শুনতে পাই আর সবাই ফিরে এসেছে শুধু আক্বা আসেন নি। এমন সময় টেলিফোন বাজল, নাজিরপুরের ও.সি. আক্বাকে খুঁজছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাদের পরিবারকে নাজিরপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নৌকা পাঠাতে হবে কি না?’

আমি বললাম, ‘না মা এখন না।’ কি ভেবে বললাম, ‘জানি না।’

এগারোটার সময় আমি ফোন করলাম থানায়। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আক্বা সামনে আছেন?’

‘না তো, এখনো আসেন নি!’

‘না? ও.সি. সাহেব, সি.আই সাহেব ...’

‘তারা তো সবাই ও.সি. সাহেবের বাসায় ঘুমিয়ে আছে।’

আমার সবকিছু জিজ্ঞেস করা ফুরিয়েছে।

বাকি রাতটা কেটেছে অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তায়। লিখে সেটা প্রকাশ করা যায় না। দরকারও নেই— এদেশে একজন মানুষের দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তার কোনো মূল্য নেই, এটা নতুন নয়, অভাবনীয়ও নয়।

সকালে রশিদ খবর আনতে গেল। খবর নিয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে। চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে, আমার বুঝতে বাকি রইল না সে কি খবর এনেছে। বললো, 'ভাই আপনে বাড়ি যান। ছোটো জমাদার বলেছে গত রাতে সাহেবকে গুলি করেছে।'

এরপরে বছবার বছভাবে এ-খবর শুনেছি কিন্তু প্রথম বার শুনে আমার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একটু স্তম্ভিত, আমি শুধু যন্ত্রের মতো মনে মনে নিজেকে বলছিলাম, 'পৃথিবীর সব দুঃখ সময়ের সাথে কমতে থাকে। দুঃখ সময়ের সাথে কমতে থাকে।' আমার অবাক লাগছিল এইভাবে সময়ও কি আমায় এই দুঃখের ওপর প্রলেপ বুলাতে পারবে?

আমি প্রথমে গেলাম ও.সি. সাহেবের বাসায়। ঢুকলাম অবাঞ্ছিতের মতো। সি.আই, কোর্ট ইন্সপেক্টর কিংবা ও.সি. সাহেব আমার দিকে তাকালেন নিরুৎসূকের মতো। আমার বক্তব্যেও তাদের যেন কোনো কৌতূহল নেই। আমি চেষ্টা করলাম, কান্না আটকিয়ে রাখতে, তবু গলার আওয়াজ হলো ভাঙা ভাঙা, 'চাচা, আব্বাকে নাকি গুলি করেছে, তাহলে ডেড বডি...'

এ-খবরেও তারা চমকালো না। 'কোথা থেকে শুনেছ' এ-ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল, আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর পেলাম না। এ-ব্যাপারটা অসম্ভব এ-রকম আশ্বাসও দিলো না। একরকম উপেক্ষিত হয়ে বের হয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে কান্না চাপতে পারলাম না।

কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এসে ঢুকলাম।

খালি বাসায় বারান্দায় বসে আমি কাঁদতে লাগলাম, হরিণটা বার বার এসে আমাকে গুঁকে গুঁকে গেল। রশিদ ইসমাইল আমায় সাব্বনা দিচ্ছিল—

মানুষের কষ্টের সময় সান্ত্বনাবাক্য যে কি খারাপ লাগে আমি আগে জানতাম না।

ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে আমার জন্যে নাস্তা পাঠান হলো, ডাক্তার সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে তাদের ঘরে বসালেন। খালাম্মা খুবই সহজ সরল মানুষ, আমায় ছেলেমানুষ ভেবে অবাস্তব সব কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। নিজের ছেলে মেয়েদের বলছিলেন, 'যাও, তোমার ইকবাল ভাইয়ের কাছে গিয়ে বসো গে।' যে-শিশুরা গত বিকেলে সারাক্ষণ আমার কোলের ওপর বসে কাটিয়েছে, এখন তারাই আমার কাছে ঘেঁষল না, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে লাগল।

আমি সারাক্ষণই কাঁদছিলাম। শিশুরা সান্ত্বনা পেলাম ডাক্তার সাহেবের কাছে। আমায় একসময় বললেন 'তুমি এখনই কাঁদছ কেন? আগে সত্যি জেনে নাও তোমার আঁকা মারা গেছেন কি না।' আমি চোখ মুছলাম, সত্যিই তো আমি কেন ভাবছি আঁকাকে গুলি করা হয়েছে? কী প্রমাণ আছে? ডাক্তার সাহেব আফজল সাহেবকে বললেন খবর আনতে, আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন ফিরে এলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তারা বললেন, তিনি জানতে

সাতের নি -। তার কঠোরতা হলে এমতদেয় সিদ্ধান্ত
দাঁড়া হলে বিচার করা না হয়।

আমার অত্যাচারে তার দাবি শুধু তখনো রক্ষা।

আমার এই অত্যাচার নিয়ে বন্দীদাতা হতে। কোন
সাক্ষর অত্যাচার নেই - আত্মসমক নিয়ম বেছে - এতটুকু
স্বাভাবিক - অত্যাচার কি হয়েছে কে জানে! দুখের
ওগো খেলানাম ডাক্তার মাথোতে রাখা। নতুনমাইল
হেটে এই অত্যাচার নিয়ে বেত হতে। অর্থাৎ দরজা।

সেটাটা ছিল আত্মসমক হাতে। অর্থাৎ
মাথোতে হাতে খেতে টিকা নিলাম। সে ক্ষয়সিটে
প্রোগ্রামী লুট হয়েছে কারোই নোটি করে নিতে
হায় না। ডাক্তার মাথোতে হাতে দুজনো
নোটি দিলেন। মাথোতে না হাতে দুজনো হাতে
মাথোতে পড়লো - হাতে মাথোতে পড়িয়ে দিল হাতে
টুকী। অত্যাচারে হস্তা দিলাম।

সিদ্ধান্তমুখে থেকে জ্বলন্ত হাতে পর্যন্ত
মাথোতে জিন মাথোতে হস্তা হাতে হাতে - কিন্তু
আমার এ হস্তা হাতে হাতে হাতে হাতে। হস্তা
হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা
হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা হস্তা

পারেন নি। তবে কর্নেলকে বলে এসেছেন ট্রায়াল ছাড়া যেন বিচার করা না হয়।

আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তখনো বাকি। আম্মাদের কাছে এই খবর নিয়ে পৌছাতে হবে। কোনো পাকা খবর নেই আব্বাকে নিয়ে গেছে এতটুকু মাত্র জানি, তারপর কি হয়েছে কে জানে। দুপুরে ভাত খেলাম ডাক্তার সাহেবের বাসায়। নয় মাইল হেঁটে এই খবর নিয়ে যেতে হবে। শক্তির দরকার।

সব টাকা ছিল আব্বার কাছে। তাই ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিলাম। ট্রেজারি লুট হয়েছে কাজেই নতুন নোট কেউ নিতে চায় না। ডাক্তার সাহেব বেছে বেছে পুরানো নোট দিলেন। শার্টপ্যান্ট না পরে লুঙ্গি আর শার্ট পরলাম, রশিদ মাথায় পরিয়ে দিলো তার টুপি। তারপর রওনা দিলুম।

পিরোজপুর থেকে হুলারহাট পর্যন্ত সাড়ে তিন মাইল রিকশায় যাওয়া যায়, কিন্তু আমাকে এ-জায়গাটুকুও হেঁটে যেতে হলো। সব রিকশাওয়ালারা নাকি লুট করতে বের হয়েছে। রাস্তা চিনি না তাই সঙ্গে রয়েছে ইসমাইল।

নয় মাইল যেতে যেতে আমি কখনো কখনো হাঁটা ছাড়া আর সবকিছু ভুলে গেলাম, কিন্তু যখনই সব মনে পড়ত তখনই মনে হতো আমার বুক ফেটে যাবে। আমি কোন মুখে আমাদের এ-খবর জানাব, এ-খবরের পর তাদের কি অবস্থা হবে ভেবে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি জেনেছি আস্তে আস্তে, তারা সেটা জানবে হঠাৎ করে একবারে। কি সাংঘাতিক একটা আঘাত পাবে।

যতই বাবলা গ্রাম কাছে আসতে লাগল ততই আমার পা আটকে আসতে লাগল। পথে ছিন্নমূল অসহায় হিন্দু পরিবারগুলোকে দেখেও আমার অনুভূতির কোনো তারতম্য হলো না। বাবলা খালের সাঁকোটা পার হতেই খাঁ সাহেবের একজন ছেলে সজ্জ নিলো। জিজ্ঞাসা করল, 'কী খবর?' আমি বললাম, 'ভালো'।

বাড়িতে পৌঁছে আমার মনে হলো যদি এ-খবর আগেই পৌঁছে যেত তাহলে আমার কিছু বলতে হতো না! কিন্তু এখনো কোনো খবর পৌঁছেনি। খবর দেওয়ার জন্যে আমি ঘরে ঢুকলাম।

মুখের কোণে পাত্রে আমি নামাভ্যন্ত। ~~অ~~ কৈ
বিভ্রম হলে, কি মন খরচ ?

স্বপ্নমি "খাটান খরচ। জাণ কি দুঃখামি ?"
কোট মুখ দ্যাকার হতে গাল
"না-না কি-

আমি এক নিঃশব্দে মত হলে দিকাম।
আজ্ঞাধীন সিঁচিয়ে গিয়ে ^{আমি আমন নি} "মুলে ডাব দেণ হযেছে।
আম্মা কিছু মুল ^{আম্মা} দিতে তালিয়ে তইলনে।
কিন্তু আম্মা সিঁচিয়ে ^{তই} মইলনে ^{কি} পরে
আম্মা ^{আম্মা} গুলিয়ে, আমি নিরে হাত
আম্মা ^{আম্মা} হেলোচি। ^{আম্মা} নিরে ^{আম্মা} হেলোচি।
~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~

~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~
~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~ ~~আম্মা~~
প্রথম তাত্ত ^{আম্মা} আম্মা ^{আম্মা} পঠিতারে ^{আম্মা} ^{আম্মা}
আম্মা ^{আম্মা} আম্মা ^{আম্মা} হলে ^{আম্মা} ^{আম্মা}।

প্রথমে শেফু পরে আম্মা নামলেন। শেফু জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর?'

'খারাপ খবর। তোরা কিছু শুনিস নি?' শেফুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, 'না! কী?'

আমি এক নিশ্বাসে সব বলে দিলাম। আব্বা মিটিংয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি, কেউ কেউ বলছে গুলি করে দেওয়া হয়েছে। আম্মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সিঁড়িতেই বসে পড়ে মুখে আঁচল গুঁজলেন, কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, 'আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি। আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি।'

প্রথমবারের মতো আমাদের পরিবারের সবার কান্নার শব্দ হাহাকার করে উঠল।*

* স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বলেশ্বরী নদীর তীর থেকে ফয়জুর রহমানের দেহাবশেষ উদ্ধার করে জানাজা পড়িয়ে পিরোজপুরের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।